ফেরারী

সমরেশ মজুমদার

সজীব প্রকাশন

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফেরারী

সমরেশ মজুমদার

প্রকাশক ঃ ম. রহমান

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ '৯৯

মুদ্রণ ঃ দে'জ অফসেট, ঢাকা।

প্রচ্ছদ ঃ শ্রী সুবীন দাস

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

লিফটের সামনে বিরাট লাইন। পাশাপাশি দুটো লিফট, কিন্তু একটার বুকের আউট অফ অর্ডার-এর লকেট ঝোলানো। ফলে লাইন লম্বা হয়েছে। স্বপ্নেন্দু রুমালে মুখ মুছতে মুছতে গেট পেরিয়ে থমকে দাঁড়ালো।

যাঃ শালা

এখন ঘড়িতে এগারটা বাজতে দশ। পৌনে এগারটায় মিসেস বক্সী দেখা করতে এসেছেন। অলরেডি পাঁচ মিনিট লেট! যেভাবে বাসে ঝুলে আসতে হয়েছে তাতে আটতলায় হেঁটে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার। সে চোখ বুলিয়ে লাইনের লোক গুণতে লাগলো। আটজনের বেশি যদি না হয় তাহলে তার সুযোগ আসবে চতুর্থ দলে। কি করা যায় বুঝে উঠছিলো না স্বপ্নেন্দু। এই সময় তার সমস্ত ইন্দ্রিয় লাফিয়ে উঠলো। হেনা সেন! মুহূর্তেই এই একতলাটা যেন বিয়েবাড়ি হয়ে গেলো। হেনা সেন ধীরে সুস্থে লাইনের শেষে দাঁড়াতেই স্বপ্নেন্দু চট করে তার পেছনে দাড়ালো!

হেনা সেন এই আটতলা অফিসের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা। সুন্দরী বললে কম বলা হবে, মহিলার শরীরে যেন ঈশ্বর মেপে মেপে জাদু মাখিয়ে দিয়েছেন। অমন সুন্দর গড়নের বুক এবং নিতম্ব এবং তার সঙ্গে মেলানো অনেকটা উন্মুক্ত কোমর দেখলেই কলজেটা স্থির হয়ে যায়, মহিলা যখন কথা বলেন তখন আফসোস হয়, কেন শেষ হলো। হেনা সেনের সঙ্গে স্বপ্নেন্দুর আলাপ নেই। এতদিন হেনা বসতো তিনতলায়। সেখানকার বড়ো অফিসারের সঙ্গে কি একটা গোলমাল হয়ে যাওয়ায় ট্রান্সফার নিয়ে গত পরশু আটতলায় এসেছেন। পদমর্যাদায় স্বপ্নেন্দু অনেক ওপরে কিন্তু এই বাড়িতে হেনাকে চেনে না এমন কেউ নেই কিন্তু তাকে?

স্বপ্নেন্দু বাতাসে অসম্ভব মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিলো। সেটা যে সামনের শরীরটা থেকে আসছে তা অন্ধও বলে দিতে পারবে। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জামার কলার ঠিক করলো। মুখটা অকারণে রুমালে মুছলো। যদিও হেনা সেনের চোখ এখন লিফটের দিকে তবু সে নিজেকে স্মার্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছিলো। মহিলার মাখন রঙা ভরাট পিঠ আর ঘাড় দেখে স্বপ্নেন্দুর মনে হলো ওর শরীরে যেন অজস্র ফগ চাপ বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুর্ধর্ষ! লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন না ফুলের বাগানে ভঙ্গী দেখলে ঠাওর করা মুস্কিল। এখনও পর্যন্ত এই অফিসের কোনো রাঘব বোয়াল ওকে স্পর্শ করতে পারে নি। মহিলার নাকি আত্মসম্মান বোধ খুব।

স্বপ্নেন্দু মিসেস বক্সীর মুখটা মনে করলো। আজ ঠিক চিবিয়ে খাবে তাকে। আটতলার সুপ্রিম বস মিসেস বক্সী। পাঁচ ফুটি ফুটবল। গায়ের রঙ অসম্ভব ফরসা কিন্তু শরীরে কোনো খাঁজ নেই, মুখটা বাতাবি লেবুর কাছাকাছি। সেই মুখে সিগারেট গুঁজে ইংরেজিতে ধমকান। জরুরি মিটিং ছিলো। হেনা সেনের কোমরের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নেন্দু বললো, থাক মিটিং। লিফটে লাইন পড়লে সে কি করবে। সঙ্গে সঙ্গে তার খেয়াল হলো। মিসেস বক্সী ইচ্ছে করলে তাকে বদলি করে দিতে পারেন।

স্বপ্নেন্দু ঠোঁট কামড়ালো। ঠিক সেই সময় হেনা সেন পেছন ফিরে তাকালেন। স্বপ্নেন্দু হাসবার চেষ্টা করলো। আহা, কি বুক। হেনা সেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি কিছু বললেন?'

আমি? না তো।' কলজেটা যেন এক লাফে গলায় উঠে এসেছে। 'মনে হলো!' হেনা সেন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন।

না। মানে এই লাইনটার কথা ভাবছিলাম। স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হলো মিসেস বক্সীর বিরুদ্ধে জেহাদটা বোধহয় কিছুটা ঠোঁট ফসকে বেরিয়েছে।

'লাইন ? লাইনের কথা কেউ আবার শব্দ করে ভাবে নাকি ?' হেনা সেন ততক্ষণে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। স্বপ্নেন্দুর খুব ইচ্ছে করছিলো কথা বলতে। তার পেছনে এখন আরও শ বারো জন দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

সে বললো, 'আপনিতো আটতলায় এসেছেন।'

'হ্যাঁ।'

'আমি ওখানকার ডি. ও। আমার নাম স্বপ্নেন্দু সোম।'

'স্বপ্নেন্দু ? বেশসুন্দর নাম তো ?'

কথাগুলো তার মুখের দিকে না তাকিয়ে বলা। তবু স্বপ্নেন্দুর মনে হলো তার নামটাকে এমন সুন্দর করে আজ পর্যন্ত কেউ উচ্চারণ করে নি। লাইনটা টুকটুক করে এগোচ্ছিলো মাঝে মাঝে। এবারে ওদের সুযোগ এসে গেলো। হেনা সেনের হাঁটা দেখে স্বপ্নেন্দুর মনে হলো দুটো সমাজ ঢেউ পাশাপাশি দুলে গেলো। লিফটে জায়গা ভরাট। হেনা সেন ওঠার পর লিফটম্যান দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছে দেখে স্বপ্নেন্দু এক চিলতে জায়গায় পা রেখে শরীরকে সেঁধিয়ে দিলো। ফলে তাকে এমনভাবে দাঁড়াতে হলো যে হেনা সেনের শরীরের অনেকটাই তার শরীরে ঠেকেছে। এত নরম আর এত মধুর কিন্তু এত তার দাহিকাশক্তি যে স্বপ্নেন্দুর মনে হলো সে মরে যাবে। আর এই লিফটটা যদি অনন্তকাল চলতো। যদি আটতলা ছাড়িয়ে একশ আটতলায় উঠে যেত। কিংবা এই মুহূর্তে লোডসেডিং-ও তো হতে পারত। মাঝামাঝি একটা জায়গায় লিফটটাকে বেশ কয়েক ঘণ্টা আটকে থাকতে হতো তাহলে। কিন্তু এসব কিছুই হলো না। বিভিন্ন তলায় যত লোক নামছে তত হেনা সেনের সঙ্গে তার দূরত্ব কমছে। সাততলায় যখন লিফট তখন এক হাত ব্যবধান।

স্বপ্নেন্দুর মনে হলো তার শরীরে যেন হেনা সেনের বিলিতি গন্ধ কিছুটা মাখামাখি হয়েছে। সে গাঢ় গলায় বললো, 'যদি কোনো প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে বলবেন মিস সেন।'

'ওমা আমাকে আপনি জানেন ?'

'চিনি কিন্তু জানি না।' কথাটা খুব নাটকীয় ভঙ্গীতে বলতেই লিফটের দরজা খুলে গেলো। হেনা সেন এমন অপাঙ্গে তাকালেন যে স্বপ্নেন্দু রুমাল মুখে তুললো।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতেই হরিমাধব ছুটে এলো, 'আপনাকে ম্যাডাম আধঘণ্টা ধরে খুঁজছেন। খুব ক্ষেপে গেছেন।'

'ক্ষেপে গেছেন ?'

'হ্যাঁ। ইংরেজিতে গালাগাল দিচ্ছিলেন একা বসে।'

স্বপ্নেন্দু দেখলো চলে যেতে যেতে হেনা সেন আবার অপাঙ্গে তাকালেন। কিন্তু এবার তার ঠোঁটে যে হাসি ঝোলানো তার মানেটা বড় স্পষ্ট। মনে মনে হরিমাধবের ওপর প্রচণ্ড চটে গেলো স্বপ্নেন্দু। একদম প্রেসটিজ পাংচার করে দিলো বুড়োটা। সে গম্ভীর মুখে নিজের ঘরে এসে বসলো। এই অফিসে সে দুই নম্বর। তার নিচে অন্তত আশীজন কর্মচারী। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ অবস্থা তার। ওপর তলা কারণে অকারণে তাকে ধমকাচ্ছে আবার নিচের তলার লোকজন সুযোগ পেলেই চোখ রাঙিয়ে যায়। নিচের তলার কর্মচারীদের য়ুনিয়ন আছে। সে না ঘটকা না ঘরকা হরিমাধবকে ডেকে এক গ্লাশ জল দিতে বলে স্বপ্নেন্দু ট্রান্সফার অ্যাণ্ড পোস্টিং-এর ফাইলটা খুলে বসলো হেনা সেনকে দেয়া হয়েছে স্ট্যাটিসটিকে। কোনো কাজ নেই সেখানে। মাসে দু'বার রিপোর্ট পাঠালেই চলে। তাছাড়া বুড়ো হালদার আছে চার্জে। লোকটা কাজ পাগল মানুষ। ওর সেকশনের সবাই

ওর কাঁধে কাজ চাপিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই অফিসে একটা কথা চালু আছে। স্ট্যাটিসটিক হলো পানিশেমেন্ট সেল। কোনো পার্টি ওই টেবিলে কোনোদিন যাবে না। সবাই পোস্টিং চায় সেকশনে। হেনা সেনকে ইচ্ছে করেই স্ট্যাটিসটিকে দেয়া হয় নি। মিসেস বক্সীর কাণ্ড এটা। এই সময় টেলিফোন বাজলো।

'সোমা স্পিকিং।'

'হোয়াট ডু যু ওয়ান্ট?' মিসেস বক্সীর গলা।

'মানে?'

'কাম শার্প। এক্ষুণি আসুন।'

জলটা খেয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো স্বপ্নেন্দু। পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুলে বুলিয়ে নিলো। তারপর দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

মিসেস বক্সীর ঘরটা বিশাল। কার্পেটে মোড়া। ঘোরানো চেয়ার এবং টেবিল ছাড়াও এক কোণে কালো ডেকচেয়ার রয়েছে বিশ্রাম নেবার জন্যে। দরজা খুলে ভিতরে পা দিতেই মিসেস বক্সীর মুখে সিগারেট দুলতে লাগলো, এই রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন অফিসার পেলে আপনি কি করতেন?'

'মানে?'

'আপনার কটায় আসার কথা ছিলো?'

'ট্রাফিক জ্যাম ছিলো ম্যাডাম! তার ওপর লিফট খারাপ।'

'এইসব সিলি বাহানা কেরানিরা দেয়। আপনি কি ডিমোশন চান।'

স্বপ্নেন্দু মাথা নিচু করলো, 'সরি, কিন্তু এটা অনিচ্ছাকৃত।'

'আই অ্যাম ফেড আপ। আপনারা কি ভেবেছেন? এটা অফিস না অন্য কিছু? দশটায় অ্যাটেন্ডেন্স। আমি সাড়ে দশটা পর্যন্ত প্রত্যেককে গ্রেস দিয়েছি। কিন্তু এগারোটায় অ্যাটেন্ডেন্স টোয়েন্টি পার্সেন্ট। আপনি ডি ও. হয়েও ঠিক সময়ে আসছেন না। এক্সপ্লেইন।

'আমি দুঃখিত।'

'দ্যাটসদি অনলি ওয়ার্ড যু নো। দিস ইজ লাস্ট ওয়ার্নিং'। সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে মিসেস বক্সী বললেন, 'বসুন।'

চেয়ারটা টেনে সন্তর্পণে বসলো স্বপ্নেন্দু। মহিলা চেয়ারে এমন ডুবে গেছেন যে শুধু মুখ আর বুকের অর্ধাংশ টেবিলের ওপর দৃশ্যমান। বুকের কোনো আদল নেই, যেন দুটো মাংসের তাল এক করে রাখা। স্বপ্নেন্দুর মনে চট করে হেনা সেনের শরীর ভেসে উঠলো। মিসেস বক্সী এবার একটা ফাইল খুললেন, 'আমার কাছে ক্রমাগত কমপ্লেন আসছে। এই অফিসে এখন ঘুষের ফেস্টিভ্যাল চলছে।

'ফেস্টিভ্যাল?'

'ইয়েস। প্রকাশ্যে যখন ঘুষ নেয়া হচ্ছে তখন ফেস্টিভ্যাল ছাড়া আর কি বলবো? কি. ও হয়ে আপনি সেসব খবর জানেন?'

'অনুমান করতে পারি।'

' কোনো স্টেপ নিয়েছেন?'

' স্পেসিফিক কমপ্লেন না থাকলে স্টেপ নেয়া মুস্কিল

'বাট ওয়ান্ট টু স্পট ইট। তোমরা চাই চাই বলে যুনিয়ন করবে আবার ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ করবে না, এটা হতে পারে না কি ভাবে স্টপ করা যায়?'

এটা খুব জটিল ব্যাপার। এই অফিস ব্যবসায়ীদের জরুরি ব্যাপার নিয়ে কাজ করে। বিভিন্ন সেকশনে তাদের আসতে হয়। দ্রুত কাজ কিংবা কিছু বিপদমুক্ত হবার জন্য তারা পয়সা খরচ করেন। কেরানিদের যেটা হাতে নেই তার জন্যে অফিসাররা আছেন। দশজন অফিসার। তারা যেসব কেস নিয়ে ডিল করেন সেখানে মোটা টাকার ব্যাপার। বেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আছে এ ব্যাপারে। অফিসাররা কখনও কমপ্লেন করেন তার অধস্তন কেরানি ঘুষ নিচ্ছে। এটা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সবার ধারণা যে কোনো কাজ করলেই পার্টিরা টাকা দিতে বাধ্য। এমন কি তার রুটিন ডিউটি করলেও।

স্বপ্নেন্দু ডি. ও। অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মাইনেপত্র এবং রিপোর্টস সঠিক রাখার দায়িত্ব তার ওপর। পার্টিদের সঙ্গে কেনো যোগাযোগ নেই। সে লক্ষ্য করেছে হরিমাধব তার পিওন হওয়ায় খুব অখুশী। প্রায়ই সে অনুরোধ করে বদলির জন্য। তার সমান মাইনের অফিসাররা গাড়িতে অফিসে আসেন, প্লেন ছাড়া বেড়াতে যান না। মনে মনে বেশ ঈর্ষা বোধ করে স্বপ্নেন্দু। কিন্তু এসব করা যায় কি করে?

'বোবা হয়ে থাকবেন না। ব্যাচেলাররা যে এমন-!' কাঁধ নাচালেন মিসেস বক্সী। কিছু বলুন।'

'দেখুন।' একটু কাশলো স্বপ্নেন্দু। 'এটা খুব জটিল ব্যাপার। অভ্যেসটা নিচ থেকে ওপরে সর্বত্র। কাকে বাদ দিয়ে কাকে ধরবেন।'

'ওপর মানে?'

'আমি শুনেছি অফিসাররাও একই দোষী।'

'দ্যাটস নট আওয়ার বিজনেস। ওদের জন্যে আরও ওপরতলায় লোক আছেন। কিন্তু দশপাঁচ একশ টাকার হরির লুট বন্ধ করা ডি. ও. হিসেবে আপনার কর্তব্য।'

'আমার?

'হ্যাঁ। আপনি অফিস বস।'

'বলুন, কি করতে হবে?'

'আপনি ট্রান্সফার করুন। আজকেই একটা লিস্ট এনে দিন আমাকে। একটা সেকশনে যে ছ'মাস আছে তাকে স্ট্যাটিস্টিক কিংবা এস্টাব্লিশমেন্টে পাঠিয়ে দিন। আর নোটিশ বোর্ড ঝুলিয়ে দিন কোনো পার্টি অফিসের ভেতর ঢুকতে পারবে না। তাদের যদি কোনো প্রয়োজন থাকে তাহলে রেসপেকটিভ অফিসারের সঙ্গে দেখা করা। প্রথমে এটা করুন তারপর দেখা যাবে।' মিসেস বক্সী আবার সিগারেট ধরালেন। স্বপ্নেন্দু তখনও ইতস্তত করছিলো, 'এ নিয়ে খুব ঝামেলা হবে।'

'ঝামেলা? চাকরিতে ঢোকার সময় তাদের কি বলা হয়েছিলো যে যত ইচ্ছে ঘুষ নিতে পারবে? তাছাড়া আপনি ব্যাচেলার মানুষ, আপনার ভয় কিসের? বোল্ড হন শাই, চিরকাল মিনমিন করে গেলে কোনো লাভ হবে না।'

নিজের ঘরে ফিরে এলো স্বপ্নেন্দু। ব্যবস্থাটা তার ভালো লাগছিলো না। সে নিজে কখনও ঘুষ নেয় নি। হয়তো ঘুষ নেবার বড়ো সুযোগ তার আসে নি বলে নেয় নি কিংবা এখনও মনে কিছু রুচি এবং নীতিবোধ কটকট করে বলে নেয়ার প্রবৃত্তি হয় নি। কিন্তু এই হুকুমটা কার্যকর করতে গেলে ভিমরুলের চাকে ঘা পড়বে। তাছাড়া কেরানিদের চোখ রাঙাবো আর অফিসারদের আদর করবো, এ কেমন কথা।

ঠিক তখনই টেলিফোনটা শব্দ করলো। ওপাশে তিন নম্বর অ্যাসেসমেন্ট অফিসার মুখার্জি, 'সোম। বক্সীর বাক্সের চাবিকাঠি তোমার হাতে, আমাকে উদ্ধার করো ভাই।'

'কি হয়েছে?'

একটা মোর দ্যান লাখ কেসে ওঁর অ্যাপ্রুভাল দরকার ছিলো। ফাইলটা চেপে রেখেছেন। একবার বলেছিলাম, কোনো কাজ হয় নি। পার্টি বললো উনি পঞ্চাশ চেয়েছেন আমি অ্যাসেসমেন্ট অফিসার কষ্ট করে মাছ জালে ঢোকালাম উনি তার ঝোল খাবেন। বোঝো ?'

'দেখি।' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো স্বপ্নেন্দু। মিসেস বক্সীর বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে এ ধরনের অভিযোগ হাওয়ায় ভাসে। পাঁচশো হাজার নয়, হঠাৎ বিশ পঁচিশের কারবারী উনি। পঞ্চাশ এই প্রথম শুনলো স্বপ্নেন্দু। এখনই সেই মহিলা তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন দশ টাকা বিশ টাকা যারা নেয় তাদের থামাতে হবে।

হরিমাধবকে হুকুম করলো সে, 'বড়বাবুকে পাঠিয়ে দাও।'

বড়বাবু চাকলাদার খুব ভালো মানুষ। সাতে পাঁচে থাকেন না। আর মাত্র তিনমাস বাকি আছে অবসরের। স্বপ্নেন্দু ধারণা লোকটা সৎ। ঘরে ঢোকামাত্র সে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি ঘুষ নেন ?'

হাঁ হয়ে গেলেন চাকলাদার। তারপর কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'নিতাম কিন্তু এখন নিই না।'

' কেন নিতেন, কেন নেন না ?'

চাকলাদার নুইয়ে পড়লেন, 'তখন অভাবের তাড়নায় না নিয়ে পারি নি। কিন্তু ভিক্ষে নিচ্ছি বলে ঘেণ্না হয়। তাছাড়া আজ বাদে কাল চলে যাব, এখন আর নোংরা হওয়ার প্রবৃত্তি হয় না।'

স্বপ্নেন্দু লোকটিকে দেখলো। মনে হলো মিথ্যে বলছেন না। তারপর নিচু গলায় বললো, 'এই অফিসের যে সমস্ত কেরানিরা ঘুষ নেয় তাদের ট্রান্সফার করতে হবে। ম্যাডামের অর্ডার। আপনি লিস্ট করুন।'

' সে তো ঠগ বাছতে গাঁ উজার হয়ে যাবে।'

হোক।'

'আর তিন মাস আছি। কেন আমাকে বিপদে ফেলছেন স্যার

'কেউ জানবে না। খুব গোপনে করুন। অর্ডারটা আমি এখানে টাইপ করাবো না। যান।'

চাকলাদার চলে যেতে স্বপ্নেন্দু চোখ বন্ধ করলো আর সঙ্গে সঙ্গে হেনা সেনের শরীরটা ভেসে উঠলো। সে বিয়ে থা করে নি। মাত্র তিরিশ বছর বয়স। সরাসরি অফিসার হয়ে ঢুকেছে পরীক্ষা দিয়ে। সামনে ব্রাইট ক্যারিয়ার। কিন্তু হেনা সেন তাকে গুলিয়ে দিলো। মহিলার মধ্যে অদ্ভুত মাদকতা আছে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সে আবার হরিমাধবকে ডাকলো, 'শোন, স্ট্যাটিস্টিক থেকে মিস সেনকে ডেকে আনো।'

'উনি এখন অফিসে নেই স্যার।'

'নেই? তুমি জানলে কি করে ?'

'উনি যে এসেই ক্যান্টিনে যান বিশ্রাম করতে।'

স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে গেলো। আচ্ছা ফাঁকিবাজ মহিলা তো! সে বিরক্ত গলায় বললো, 'ক্যান্টিন তো এই বাড়িতেই। সেখান থেকে ডেকে নিয়ে এসো।'

হরিমাধব চলে যাওয়ার পর স্বপ্নেন্দুর মনে হলো না ডাকলেই হতো। হয়তো মহিলা অসুস্থ, বাইরে থেকে ঠাওর করা যায় না। তাছাড়া ওরকম সুন্দরী মহিলাদের একটু আধটু সুবিধা দেয়া দরকার দশটা-পাঁচটা কলম পিষলে কি ওই শরীর থাকবে ? কিন্তু সেই সঙ্গে

স্বপ্নেন্দুর ভেতরটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠলো। সে চট করে চুলটা আচড়ে রুমালে মুখ ঘষে নিলো। কাল থেকে দুটো রুমাল নিয়ে বোরোতে হবে। একটা খুব দ্রুত ময়লা হয়ে যায়।

আবার টেলিফোন বাজলো। ওপাশে সুজিত। ফিল্মে অভিনয় করে বেশ পরিচিত হয়েছে। একসঙ্গে কলেজে পড়ত এবং এখনও যোগাযোগ আছে। সুজিত জিজ্ঞাসা করলো, কাল বিকেলে কি করছো?'

'কিছুই না।'

চলে এসো। আমার বাড়িতে সন্ধ্যে সাতটায়। ফিল্মের কিছু মানুষ আসবে। একটা গোপন খবর ঘোষনা করবো।'

'কি খবর?'

'উহু এখন বলবো না। ওটা সারপ্রাইজ থাক। এসো কিন্তু। শুধু বলছি আমি বিয়ে করছি। দারুণ, দারুণ এক মহিলাকে।

কট করে লাইনটা কেটে দিলো সুজিত। রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ঈর্ষাবোধ করলো সে। এমন কিছু ভালো দেখতে নয় কিন্তু সুজিত আজ বিখ্যাত। প্রচুর টাকা পাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে দারুণ মহিলাকে বিয়ে করছে। আর সে একটা স্টুডেন্ট হয়েও কলা চুষছে। রাস্তাঘাটে কোনো মেয়ে তার দিকে তেমনভাবে তাকায় না। কলেজ লাইফে সুজিতের থেকে তার সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিলো।

এই সময় দরজায় শব্দ হতেই মুখ তুলে তাকালো স্বপ্নেন্দু। মনে হলো দম বন্ধ হয়ে যাবে তার। হেনা সেনের মুখ থমথমে, 'ডেকেছেন।'

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে খেয়াল সে অফিসার। হাত বাড়িয়ে চেয়ারটা দেখিয়ে বললো, 'বসুন। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

হেনা সেন এগিয়ে এলেন রাজহাঁসের ভঙ্গিতে। 'কি ব্যাপার?'

'আগে বসুন, দাঁড়িয়ে কথা বলা শোভন নয়।' ব্যাপারটা যেন হেনা সেনের মনঃপুত হচ্ছিলো না। তবু চেয়ারখানা সামান্য টেনে নিয়ে থমথমে মুখে তিনি বসলেন। স্বপ্নেন্দু সেটা লক্ষ্য করলো। তারপর জিজ্ঞাসা করলো, 'এই অফিসের পরিবেশ আপনার কেমন লাগছে?'

'ভালোই।'

'কিন্তু আমার ওপরওয়ালা মনে করেন পরিবেশ আদৌ ভালো নয়। তিনি চান অবস্থার উন্নতি করতে। আপনি সেকশনে আসতে চান?'

'সেকশনে? না না। ওখানে অনেক ঝামেলা। আমি বেশ আছি।'

'কিন্তু মিসেস বক্সী আপনাকে সেকশনে পাঠাতে বলেছেন।'

এবার হাসলেন হেনা সেন, 'উনি আমাকে সহ্য করতে পারেন না। আপনি নিশ্চয়ই কারণটা বুঝতে পারছেন। সেকশনে যাওয়ায় যাদের ইন্টারেস্ট আছে তাদের পাঠান। আমি চলি।'

'একটু বসুন।' স্বপ্নেন্দু খুব অসহায় বোধ করছিলো, 'একটা কথা, এই সব আলোচনার কথা অফিসে গিয়ে বলবেন না।'

কেন?'

'এটা টপ সিক্রেট।'

'তাহলে আমাকে জানালেন কেন?'

ঠোঁট কামড়ালো স্বপ্নেন্দু, 'আমার মনে হয়েছিলো আপনাকে বিশ্বাস করা যায়

'ধন্যবাদ।' হেনা সেন সামান্য মাথা দুলিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাকে এক্সপ্লেনই করতে বলবেন কেন আমি অফিসে এসেই ক্যান্টিনে যাই।'

'আপনি জানেন আমি সেটা পারি না।'

'আমি জানি?'

'জানা উচিত।'

এবার হাসিটা মিষ্টি হলো। তারপর বেরিয়ে গেলেন হেনা সেন। কয়েক মুহূর্ত বাদে স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হলো, একি করলো সে। একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে চরম অন্যায় হয়ে গেলো। শুধু একজন সুন্দরী মহিলার শরীর দেখে সে মাথা খারাপ করে ফেললো? এখন উনি যদি অফিসে বলে বেড়ান তাহলে ম্যাডাম তাকে চিবিয়ে খাবে। অথচ এখন আর কিছু করার নেই।

বিকেলে অফিসে হইচেই পড়ে গেলো। হেনা সেন নয়, কি করে যে খবর ফাঁস হয়ে গেছে তা কেউ জানে না। হয়তো হরিমাধব কিংবা বক্সীর বেয়ারা অথবা বড়বাবু, সোর্সটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু অফিসের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেলো। ঝেঁটিয়ে ট্রান্সফার হচ্ছে এই খবরটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো; বিকেলে চারটেয় জানতে পারলো স্বপ্নেন্দু। একজন ছাপান্ন বছরের প্রৌঢ় এসে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন, 'স্যার, আমাকে ধনে প্রাণে মারবেন না।'

'কি হয়েছে।'

'আমার তিনটে মেয়ে। সেকশন থেকে সরিয়ে দিলে ওদের বিয়ে দিতে পারব না। একদম ভরাডুবি হয়ে যাবে স্যার।' কেঁদে ফেললেন ভদ্রলোক।

'আপনি জানলেন কি করে?' স্বপ্নেন্দু সোজা হয়ে বসলো।

'সবাই জানে স্যার।'

তারপর একটার পর একটা অনুরোধ। কারো মেয়ের বিয়ে হয় না, কারো সংসার চলবে না। অফিস থেকে চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে আসছিলো। স্বপ্নেন্দু টেলিফোন করলো মিসেস বক্সীকে। রেবে গেলো টেলিফোন। হরিমাধব খোঁজ নিয়ে জানালো ম্যাডাম ঘন্টাখানেক আগে অফিস থেকে বেরিয়ে গেছেন।

স্বপ্নেন্দুর মাথায় কিছুতেই ঢুকছিলো না কি করে খবরটা ফাঁস হয়ে গেলো। সে চাকলাদারকে ডেকে পাঠালো, 'আপনি স্টাফদের বলেছেন?'

'না স্যার। তবে শুনেছি ম্যাডাম নাকি ওঁর পিওনকে বলেছেন।'

'ম্যাডাম?' স্বপ্নেন্দু হাঁ হয়ে গেলো! ঠিক সেই সময় দল বেঁধে স্টাফরা তার ঘরে প্রবেশ করলো। একসঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি অভিযোগ এবং গালাগালের বন্যা বয়ে যেতে লাগলো। তাকে ঘিরে অনেকগুলো উত্তেজিত মুখ। স্বপ্নেন্দু বলার চেষ্টা করলো, 'আপনারা আমার কাছে এসেছেন কেনো? মিসেস বক্সীর কাছে যান। তিনিই অল ইন অল।'

একজন বললো, ' সে শালী পালিয়েছে।'

'ঠিক আছে একজন বলুন। এনি অফ ইউ।'

'শুনুন। অ্যাদ্দিন ধরে আমরা সেকশনে কাজ করছি, এখন এক কথায় সরাতে পারেন না। এতগুলো লোকের ভাতে হাত দেবার কোনো রাইট আপনার নেই।'

'ভাতে হাত।'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু এটাতো বেআইনি।'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার উঠলো অজস্র অশ্লীল শব্দ। একজন চেঁচিয়ে বললো, 'অফিসাররা যখন মাল কামান তখন বুঝি আইন থাকে।' এই যুক্তির কাছে নরম হতেই হয়। স্বপ্নেন্দু মিসেস বক্সীকে একথাই সকালে বলেছিলো। সে বললো, 'আমি বুঝতে পারছি। বিশ্বাস করুন আমি এসব কিছুই জানি না। মিসেস বক্সী এলে আমি নিশ্চয়ই আলোচনা করবো।'

'আপনি জানেন না।?'

'না।' স্বপ্নেন্দু স্রেফ অস্বীকার করলো।

'মিথ্যে কথা। তাহলে স্ট্যাটিস্টিক থেকে মিস সেনকে ডেকে পাঠালেন কেনো?' মিস সেনকে সেকশনে দিতে চান?'

'মিস সেন?' ধক্ করে উঠলো স্বপ্নেন্দুর বুক। মহিলা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন নাকি? ওফ, কি বোকামিই না করেছিলো সে। একটা মেয়েছেলের সুন্দর চেহারা দেখে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো!

কি, চুপ করে আছেন কেনো?'

'ওর সঙ্গে আমার কি কথা হয়েছে আপনারা জানেন?' শেষ চেষ্টা করলো সে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার বাড়লো কেউ একজন ছুটলো হেনা সেনকে ডেকে আনতে। তারা সামনাসামনি ভজিয়ে নিতে চায়। স্বপ্নেন্দু ঘামতে লাগলো এই লোকগুলোকে তার ক্ষিপ্ত নেকড়ের মতো মনে হচ্ছিলো। তার ঘরে হামলা হচ্ছে অথচ কোনো অফিসার এগিয়ে আসছেন না তাকে উদ্ধারের জন্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেনের আবির্ভাব হলো। ঘরে ঢুকে বললেন, 'কি ব্যাপার? আমায় কেনো? যেন তিনি কিছু জানেন না।

নেতা গোছের একজন প্রশ্ন করলো, 'মিস সেন, আজ সকালে উনি কি ট্রান্সফার পোস্টিং নিয়ে কিছু বলেছিলেন আপনাকে?' ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন হেনা সেন। হ্যাঁ।

আর গলা শুকিয়ে গেলো স্বপ্নেন্দুর। নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছে করছিলো তার। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা বাড়লো মিথ্যুক, লায়ার।

'কি বলেছিলেন?'

'আমি অফিসে এসে রেস্ট নিতে ক্যান্টিনে যাই বলে উনি আমাকে বলেছিলেন এটা নাকি অন্যায়, প্রয়োজন হলে আমাকে ট্রান্সফার করে দেবেন। আমার আবার একটু রেস্ট না নিলে চলে না।' হেনা সেন হাসলেন।

আর স্বপ্নেন্দুর মনে হলো সে গভীর কুয়োর তলা থেকে ভুস করে ওপরে উঠে এলো। স্পষ্টতই আক্রমণকারীদের মুখে এখন হতাশা। কেউ কেউ হেনা সেনের দিকে অবিশ্বাসী চোখে তাকাচ্ছে। এবার হেনা সেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি জানতে পারি কি কেনো এঁদের ট্রান্সফার করা হচ্ছে?'

'আমি জানি না, মিসেস বক্সী বলতে পারবেন।'

'এঁদের বিরুদ্ধে কী প্রমাণ আছে যে এরা পার্টির কাছে ঘুষ নেন? যদি না থাকে তাহলে এরকম অ্যাকশান নেয়া মানে এঁদের অপমান করা। অনুমানের ভিত্তিতে আপনারা কিছুই করতে পারেন না।'

হেনা সেন হেসে হেসে কথাগুলো বলতেই সোচ্চার তাঁকে সমর্থন করলো সবাই।

যাওয়ার আগে স্টাফরা বলে গেলো যদি এইরকম অর্ডার বের হয় তাহলে কাল থেকে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। ঘর ফাঁকা হয়ে গেলো রুমালে মুখ মুছলো স্বপ্নেন্দু। খুব জোর বেঁচে গেলো সে আজ। হেনা সেন তাকে বাঁচিয়ে দিলো। মহিলা তাকে নাও বাঁচাতে পারতেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিন্তা মাথায় আসা মাত্র উৎফুল্ল হলো সে। মেয়েরা যাকে

একটু নরম চোখে দ্যাখে, তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, কোথায় যেন পড়েছিলো সে। এত ঝামেলার মধ্যেও এটুকু ভাবতে পেরে মনটা প্রশান্তিতে ভরে গেলো তার। খুব ইচ্ছে করছিলো হেনা সেনকে ডেকে কৃতজ্ঞতা জানায় কিন্তু সাহস হলো না তার। সঙ্গে সঙ্গে স্টাফদের মনে অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তবে মহিলা খুবই বুদ্ধিমতী। তাকেও যেমন বাঁচালো তেমনি স্টাফদেরও চটালো না। চমৎকার।

স্বপ্নেন্দু ঠিক করলো মিসেস বক্সীর ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দেবে। তিনি যা করেন তাই হবে। সে আর এই ব্যাপারে থাকবে না। যদি মিসেস বক্সী চোখ রাঙান তাহলে হেড অফিসে বিস্তারিত জানাবে।

ছুটির পর বেরিয়ে এসে বাসস্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো স্বপ্নেন্দু। এই সময়টায় তার কিছুই করার থাকে না। মা মারা যাওয়ার পর থেকে বাড়ির কোনো আকর্ষণ তার কাছে নেই। হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলায় চলে এলো সে। আর তখনই আত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। স্বপ্নেন্দু এড়াতে চাইছিলো কিন্তু পারলো না। অত্রেয়ী তাকে ডাকলো, 'কি ব্যাপার, কেমন আছ?'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়লো, 'ভালো। তুমি?'

'আর থাক। তুমি তো কোনো খোঁজখবর নাও না।'

'কি হবে নিয়ে। তাছাড়া তোমার স্বামী তো সেটা পছন্দ করেন না।'

'ওঃ স্বপ্নেন্দু! এই কথাটা শুনতে শুনতে আমি পাগল হয়ে গেলাম। আমার সব কাজেই যদি ওর মতামত নিতে হয় তাহলে-!' বলতে বলতে কথা ঘোরালো সে, কোথায় যাচ্ছ?'

' কোথাও না। বেকার মানুষ।'

'তুমি আবার বেকার। এখনও বান্ধবী পাওনি?'

' সে কপাল কোথায় ?'

'চলো আমাদের ওখানে চলো।'

'মাথা খারাপ। স্ত্রীর বন্ধুকে দেখলে কোনো স্বামী সুখী হয় না।'

'আমি আর পারছি না স্বপ্নেন্দু। এই লোকটার সঙ্গে একসঙ্গে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

স্বপ্নেন্দু রাস্তাটার দিকে তাকালো। অজস্র মানুষ এই সন্ধ্যেবেলায় যাওয়া-আসা করছে। অথচ অত্রেয়ী এই পরিবেশকে ভুলে গিয়ে নিজের মনের কথা স্বচ্ছন্দে বলে যাচ্ছে। স্বপ্নেন্দু তবু বোঝাবার চেষ্টা করলো, 'এভাবে বলো না, তুমি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছো। অতীতটাকে ভুলে যেও না।'

'ভুল করেছিলাম।' তারপরেই যেন খেয়াল হলো অত্রেয়ীর, 'কোথাও বসবে?'

'তোমার দেরি হয়ে যাবে না ?'

'আই ডোন্ট কেয়ার। তোমাকে এতদিন বাদে দেখলাম। তোমার অফিসের টেলিফোন নাম্বারটা যে কাগজে ছিলো সেটাও ছিঁড়ে ফেলেছে, কিরকম ক্রুট।'

'আজ নয় অত্রেয়ী। আমার মন ভালো নেই।

'একদিন কিন্তু আমার কাছে এলে তোমার মন ভালো হয়ে যেত।'

'সে অনেক দিন আগের কথা। তখন আমরা ছাত্র-।'

'তোমার নাম্বারটা দাও তাহলে।'

স্বপ্নেন্দু টেলিফোন নাম্বারটা বলতে অত্রেয়ী সেটাকে তিন চারবার নানান রকম করে মনে গেঁথে রাখলো তারপর জিজ্ঞাসা করলো, তুমি এখনও সেই পুরোনো বাড়িতেই আছে?'

'আর কোথায় যাব ?' মা চলে যাওয়ার পর আমি আগলাচ্ছি।'

হঠাৎ ব্যাগ খুললো অত্রেয়ী। তারপর কি ভেবে সেটা বন্ধ করে বললো, 'তুমি হয়তো আমার কথা আজকাল আর ভাবো না কিন্তু আমার বড্ড মনে পড়ে তোমাকে। আমি ভুল করেছি স্বপ্নেন্দু, বিরাট ভুল।'

অত্রেয়ী চলে গেলে আরও আনমনা হয়ে গেলো সে। ছাত্রজীবনে কি তার সঙ্গে অত্রেয়ীর প্রেম হয়েছিলো ? না, ঠিক প্রেম বলে না ওটাকে। তবে অত্রেয়ীর কাছে যেতে ভালো লাগত তার। আর অত্রেয়ীর নজর ছিলো আরও ওপরের দিকে। ভালো চাকুরে, প্রচুর পয়সা এবং ক্ষমতাবান মানুষের জন্যে তার লোভ ছিলো। তাই সেই বয়সে ওরকম একটা মানুষকে অবশ্যই সে স্বচ্ছন্দে স্বপ্নেন্দুদের ভুলে যেতে পেরেছিলো। কষ্ট হয়েছিলো অবশ্যই কিন্তু সেটা ভুলে যেতে সময় লাগে নি। প্রেম হলে কি তা সম্ভব হতো। শরীরে যৌবন নেই। সেই চাপল্য নেই, আকর্ষণ করার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। এই অত্রেয়ীর সঙ্গে নবীন প্রেম হয় না, পুরনো বন্ধুত্ব রাখা যায় মাত্র। কথাটা মনে হওয়ামাত্র হেনা সেনের শরীরটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে দম বন্ধ হয়ে গেলো তার। হেনা সেনকে কৃতজ্ঞতা জানানো হলো না। কাল এবং পরশু ছুটি। সোমবারে ঘরে ডেকে ওটা জানাতে গেলে হয়তো নানান কথা উঠবে। তাছাড়া সেদিন অফিসের আবহাওয়া কি রকম থাকবে তাও সে জানে না।

অত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা না হলে হয়তো বুকের ভেতর হেনা সেনের জন্যে এতটা আনচান শুরু হতো না। অত্রেয়ী যন্ত্রণাটা যেন তার মনে ছুঁইয়ে চলে গেলো। স্বপ্নেন্দুর মনে হলো হেনা সেনের বাড়িতে গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এলে কেমন হয় ? অফিস থেকে বের হবার আগে সে ওর ফাইল থেকে বাড়ির ঠিকানাটা জেনে এসেছে।

পরমুহূর্তেই চিন্তাটাকে বাতিল করলো সে। হেনা সেনের বাড়িতে যাওয়া একজন অফিসারের পক্ষে সম্মানজনক হবে না। হেনা যদি বিরক্ত হয় তাহলে অফিসে ঢি ঢি পড়ে যাবে। স্টাফরা তো বটেই মিসেস বক্সী খড়গহস্ত হবে। তাছাড়া হয়তো গিয়ে দেখবে ওর কোনো সহকর্মী সেখানে বসে আছে তাহলে? বেইজ্জতের একশেষ। না, এটা অত্যন্ত ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে।

এক কাপ চা খেয়ে হাঁটছিলো স্বপ্নেন্দু। এই সময় বাচ্চা ছেলেটা পেছনে লাগলো। ধর্মতলায় এদের প্রায় চোখে পড়ে। একগাদা টাটকা ফুল নিয়ে এরা অনুনয় করে কিনতে। স্বপ্নেন্দু শুনেছে এই সব ফুলের অতীত নাকি ভালো নয়। কবরস্থান থেকে তুলে নিয়ে এসে নাকি বিক্রি করা হয়। তাছাড়া ফুল নিয়ে কি করবে ? বাড়িতে যার ফুলদানি নেই তার ফুলের কি প্রয়োজন। ছেলেটাকে হটিয়ে দিলেও সে পিছু ছাড়ছিলো না। ফুলগুলোর প্রশস্তি করতে করতে আকুতি জানাচ্ছিলো কেনবার জন্যে। প্রায় বাধ্য হয়ে স্বপ্নেন্দু এবার ফুলগুলোর দিকে তাকালো। আর তখনই তার নজরে পড়লো একটা আধ ফোঁটা বড় রক্ত গোলাপ কি রকম নরম সতেজ চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে। পুরো ফোটে নি ফুলটা কিন্তু এমন ডাঁটো এবং উদ্ধত ভঙ্গী, পাঁপড়ির গায়ে জলের ফোঁটা যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। সে ছেলেটাকে বললো, 'ঐ ফুলটার দাম কত ?'

'আট আনা সাব।' হাত বাড়িয়ে তুলে দিলো সে গোলাপটিকে। লম্বা ডাঁটি এবং তাতে দুটো পাতা। দর করলো না স্বপ্নেন্দু। দাম মিটিয়ে দিয়ে নাকের সামনেধ রতেই অদ্ভুত

জোরালো অথচ মায়াবী গন্ধ পেলো। এবং তখনই মনে হলো এই গন্ধটা তার খুব চেনা। চোখ বন্ধ করতই হেনার শরীর ভেসে উঠলো। আজ সকালে লিফটে হেনা সেনের শরীর থেকে সে এই রকম গন্ধ পেয়েছিল। আদুরে চোখে ফুলটাকে দেখলো স্বপ্নেন্দু আর তারপরেই মনে হলো হেনা সেনের শরীরের সঙ্গেও এই ফুলের মিল আছে। এইরকম তাজা, উদ্ধত, অহঙ্কারী এবং মহিমাময়। শেষ শব্দটা ভাবতে পেরে খুব ভালো লাগলো তার। মহিমায়ময়।

ফুলটার দিকে তাকিয়ে স্বপ্নেন্দু দ্বিতীয়বার মনে হলো তার উচিত একবার হেনা সেনের বাড়িতে যাওয়া। সে তো কখনও ফুল কেনেনি। কোনো ফুলওয়ালা তার পেছনে জোটেনি কোনদিন। আজ কেন হলো ?

আর ওই ছেলটার কাছে এই ফুলটাই বা থাকবে কেনো যা দেখলে হেনা সেনকে মনে পড়ায়! হেনা সেন থাকে ফুলবাগানের সরকারি ফ্ল্যাটে। তেমন বুঝলে একটা মিথ্যে ওজর দিতে অসুবিধে হবে না। তাছাড়া যে মেয়ে তাকে বাঁচাতে অতগুলো সহকর্মীর সামনে কথা সাজালো সে নিশ্চয়ই অফিসে গিয়ে নালিশ করবে না।

এইসব ভেবে স্বপ্নেন্দু একটা ট্যাক্সি ধরলো। পারতপক্ষে শেয়ারে ছাড়া সে ট্যাক্সিতে চড়ে না। কিন্তু আজ মনে হলো এই ফুলটাকে নিয়ে বাসে ওঠা যায় না। ভেতরে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো সে। ঘাম জমছিলো কপালে।

সরকারি ফ্ল্যাটের কাছে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে স্বপ্নেন্দুর মনে হলো এই লাল গোলাপটাকে হাতে ধরে পথ হাঁটা উচিত হবে না। এটাকে দেখলে মানুষের কৌতূহল হবেই। অথচ পকেটে রাখলে ফুলটা নষ্ট হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত সে রুমাল বের করে সযত্নে তাতে ফুলটাকে ঢেকে ঝুলিয়ে নিলো এমন করে যে কেউ দেখলে চট করে বুঝতে পারবে না।

নম্বর খুঁজে খুঁজে ফ্ল্যাটটা পেতে মিনিট পনেরো লাগলো। তিন তলায় দরজার গায়ে লেখা আছে মিস্টার এস কে সেন। এই লোকটা কে হতে পারে ? হেনার বাবা ? মেয়ের অফিসার বাড়িতে এসেছেন শুনলে ভদ্রলোক কি মনে করবেন? কিন্তু এখন ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। একটু মরীয়া ভাব এসে গেলে স্বপ্নেন্দু কলিং বেলে আঙুল রাখলো। আর আশ্চর্য, দরজা খুললো হেনা নিজে।

স্বপ্নেন্দু দেখলো লালশাড়ি লাল ব্লাউজ হেনাকে ঠিক রক্তগোলাপটার মতো দেখাচ্ছে। অফিস থেকে ফিরে স্নান করেছে নিশ্চয়ই কারণ লাবণ্য ঢলঢল করছে সারা অঙ্গে। স্বপ্নেন্দু কোনোরকম বলতে পারলো, 'এলাম।'

'হ্যাঁ আসুন।' হেনা সরে দাঁড়াতে স্বপ্নেন্দু ঘরে ঢুকলো। সুন্দর সাজানো আধুনিক ঘর। দরজাটা ভেজিয়ে হেনা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হলো রুমালটার কথা। ওটা এখনও হাতে ঝোলানো। যতটা সম্ভব ওটাকে আড়াল করে সে কথা বললো, 'আমি না এসে পারলাম না। আজ আপনি আমাকে অফিসে বাঁচিয়েছেন। আমি যে কি বলে আপনাকে-'

শব্দ করে হেসে উঠলেন হেনা সেন। তাঁর শরীরে পুরীর ঢেউগুলোকে চকিত দেখতে পেলো স্বপ্নেন্দু। হেনা সেন হাসতে হাসতে বললেন, 'বালিহারি আপনি! ওই জন্যে বাড়ি বয়ে ধন্যবাদ জানাতে এলেন! এখন যদি খবরটা অফিসে জানাজানি হয়ে যায়? আর মুখটা অমন করেছেন কেনো ? বসুন বসুন।'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়লো, 'না বসবো না। রাতও তো হলো।'

'রাত এমন কিছু হয় নি। দাঁড়ান, আমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।' কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে হেনা সেন ভেতরে চলে গেলেন। স্বপ্নেন্দু আড়ষ্ট হয়ে বসলো। রুমালটাকে সে সন্তর্পণে সোফার ওপর রেখে দিলো। তিনঘরের ফ্ল্যাট। অথচ অন্য মানুষের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না।

একটু বাদেই এক প্রৌঢ়াকে নিয়ে হেনা সেন ফিরে এলেন, 'আমার মা।'

স্বপ্নেন্দু ইচ্ছে করছিলো না প্রণাম করতে কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি হবে মনে হওয়ায় নমস্কার করলো সে। মহিলা বললেন, 'বসুন।'

'আমাদের অফিসার! খুব জাঁদরেল লোক।' হেনা সেন জানালেন। মহিলা বললেন, 'আপনি কি এদিকেই থাকেন?'

'না। মানে আমার এক বন্ধুর কাছে এসেছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।'

'ওর পুরনো অফিসের পরিবেশ ভালো ছিলো না। একজন তো খুব বিরক্ত করতেন। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে নিষেধ করলাম বাড়িতে আসতে। আসলে বাবা, এখানে কোনো পুরুষ মানুষ যদি ঘন ঘন আসে তাহলে নানান কুকথা উঠবে। আমরা মায়ে মেয়েতে থাকি তো।'

'সে তো নিশ্চয়ই!' স্বপ্নেন্দু ঢোক গিললো।

'ওর বাবা যা রেখে গিয়েছেন তাতে মেয়ের চাকরি করার দরকার হয় না। কিন্তু মেয়ে সে কথা শুনলে তো! এখন একটা ভালো ছেলে পেলে বেঁচে যাই।'

হেনা চাপা গলায় বললেন, 'আঃ মা! তুমি আবার আরম্ভ করলে!'

পৌঢ়া স্বপ্নেন্দুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই দ্যাখো, বলতেই আপত্তি। কিন্তু-।'

'কোনো কিন্তু নয়। এখন ভেতরে গিয়ে রামের মাকে বলো কফি করতে।'

কিন্তু স্বপ্নেন্দু উঠে দাঁড়ালো, 'মাফ করবেন! আমি কফি খাবো না! মানে একটু আগে চা খেয়েছি তো!'

'ও অন্য জায়গায় চা খেয়ে আমার কাছে এসেছেন?'

'না। মানে, ঠিক আছে আর একদিন খাবো।'

'আর একদিন খাবেন মানে? শুনলেন না মা একটু আগে কি বললো। ঘনঘন এ বাড়িতে এলে পাঁচজনে কুকথা বলবে।' হেনা সেন আবার হাসিতে ভেঙে পড়লেন। স্বপ্নেন্দু ঠোঁট কামড়ালো! তাকে স্পষ্ট বলে দেয়া হচ্ছে আর কখনও এই বাড়িতে এসো না!

প্রৌঢ়া অবশ্য বলে উঠলেন, 'ছিঃ এভাবে ঠাট্টা করতে হয়।'

'আমি যে ঠাট্টা করলাম তা উনি বুঝতে পেরেছেন। সত্যি চা-কফি খাবেন না?'

স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়লো, 'চলি আবার দেখা হবে।'

'আপনার রুমাল পড়ে রইলো ওখানে।'

স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হলো। সে কয়েক পা ফিরে এসে রুমালটাকে তুলে নিলো। এতসব সত্ত্বেও তার খুব ইচ্ছে করছিলো হেনা সেনের হাতে টাটকা লাল গোলাপটা তুলে দিতে। কিন্তু এইসব কথাবার্তা আর প্রৌঢ়া মহিলার সামনে সেটা দেয়া অসম্ভব। ওরা দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিলেন। সিঁড়িতে পা দেবার আগে স্বপ্নেন্দু শুনলো হেনা বলছেন, 'ঝামেলাটা নিজের কাঁধে না রেখে মিসেস বক্সীর ওপর চাপিয়ে দিন। আপনার কি দরকার যেচে অপ্রিয় হবার।'

নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্বপ্নেন্দু টলমল হলো। হেনা সেন তার সঙ্গে যতই রসিকতা করুক না কেন শেষ সময়ে যে কথাটা বললো তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় ওর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। কোনো কোনো মানুষের একটা বাহ্যিক স্বভাব থাকে পরিহাস

করার কিন্তু ভেতরের আন্তরিকতা যখন বেরিয়ে আসে তখন বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। হেনা সেই রকমের মেয়ে।

বুঁদ হয়ে হাঁটছিলো স্বপ্নেন্দু। লাল জামা লাল শাড়ি সাদা নিটোল ডানার মতো কাঁধ থেকে হাত নেমে এসেছে যার সেই মেয়ে তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছিলো। রুমালটাকে নাকের নিচে নিয়ে আসায় সে আবার হেনা সেনের শরীরে ঘ্রাণ আবুক নিতে পারলো।

বাড়ি ফিরে স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হলো আজ রান্না-বান্না বন্ধ। ওর রাত দিনের কাজ করে যে লোকটা সে দেশে গেছে কার অসুখের খবর পেয়ে। সামনে দুদিন ছুটি বলে স্বপ্নেন্দু আপত্তি করে নি। এখন রাত্রে হরিমাটর।

দরজার খুলে সে শোওয়ার ঘরে এলো। একটা ফুলদানি নেই যেখানে গোলাপটাকে রাখা যায়। টেবিলে একটা সুন্দর কাঁচের বাটি ছিলো, স্বপ্নেন্দু তার মধ্যে ফুলটাকে বসিয়ে দিলো। একটুও টসকায়নি সেটা, তেমনি উদ্ধত এবং আদুরে। আর কি টকটকে লাল। কি খেয়াল হতে বাটিটাকে উল্টো করে বসিয়ে দিতে স্বপ্নেন্দু আবিষ্কার করলো ফুলের রঙ কাঁচের আস্তরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে। আরও রহস্যময় দেখাচ্ছে। সামান্য দূরে সরে কাঁচাচাপা ফুলটাকে দেখলো সে। ঠিক মধ্যিখানে গর্বিত ভঙ্গিতে রয়েছে।

এক কাপ কফি আর কয়েকটা বিস্কুট খেয়ে শুয়ে পড়লো স্বপ্নেন্দু। আজ সারাদিন অনেক ঘটনা ঘটে গেলো। চারদিকে শুধুই নোংরামো একমাত্র ব্যতিক্রম হেনা সেন। কিন্তু তার কাছে আগের অফিসের কোনো অফিসার প্রায়ই যেত! লোকটাও কি হেনার প্রেমের পড়েছিলো ? মনে মনে খুব জেলাস হয়ে উঠলো সে। হেনা লোকটাকে বাড়িতে এলাউ করত কেন ? হেনারও কি দুর্বলতা ছিলো? স্বপ্নেন্দুর অস্বস্তি শুধু হলো। তার খেয়াল হলো হেনা স্বইচ্ছায় ট্রান্সফার চেয়ে এই অফিসে এসেছে। দুর্বলতা থাকলে নিশ্চয়ই তা করতো না।

কিন্তু অফিসের পরিবেশটা জঘন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর চেয়েও কোনো কলেজে মাস্টারি নিয়ে অনেক বেশি আরামে থাকা যেত। আসলে এখন মানুষের লোভের কোনো সীমা নেই। চাই আরও চাই। যেমন অত্রেয়ী। একসময় যেটাকে সুখ বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো এখন সেটা থেকে মুক্ত হতে চাইছে। সে সুখের মালা যেন ফাঁস হয়ে বসেছে গলায়। আসলে সেখানেও একটা অতৃপ্তি, যা অন্য লোভ থেকে মনে জন্মেছে। স্বপ্নেন্দু শুয়ে শুয়ে হাসলো। আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কোনো না কোনো লোভের শিকার। কাকে দোষ দেবে। এই নিয়ে মানিয়ে গুছিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। সে নিজেও তো লোভার্ত হয়ে হেনা সেনের বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলো। অথচ যাওয়ার আগে কতকগুলো বাহানা তৈরি করতে হয়েছিলো নিজের কাছে কৈফিয়ত দিতে। নিশ্বাস ফেলেছিলো মৃদু তালে স্বপ্নেন্দু। তার তিনতলার ঘরে অল্প অল্প হওয়া আসছে। মাথার ওপর ফ্যানটা ঘুরছে না। কলকাতা শহর কখন যে বিদ্যুৎহীন হয়ে গেছে তা টের পায় নি। স্বপ্নেন্দুর চোখের সামনে লাল শাড়ি লাল জামা। শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়লো তাই নিয়ে।

সেই মধ্যরাত কলকাতার বায়ুমণ্ডলে গুরুতর প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। কোনো হঠাৎ সরে আসার নক্ষত্রের আকর্ষণে পৃথিবীর এই বিশেষ শহরটি উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। সামান্য ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ায় কলকাতার মানুষের ঘুম ভেঙে গেলো। স্বপ্নেন্দু লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসে দেখলো জানলা দিয়ে প্রচণ্ড তপ্ত বাতাস ঘরে ঢুকছে। এত তার তাপ যে গায়ে ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে। এবং সমস্ত শহর জুড়ে মানুষের চিৎকার শুরু হয়েছে। যারা ভয় পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলো তারা আবার একটা আচ্ছাদন খুঁজছে। মানুষের আর্তনাদ শহরটা

উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলো। টলতে টলতে জানলা বন্ধ করে দিতে যেটুকু সময় তাতেই সমস্ত শরীর ঝলসে গেলো স্বপ্নেন্দুর। চিৎকার করে উঠলো সে। মনে হচ্ছিলো অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অন্ধ ঘরেও উত্তাপ কমছিলো না। স্বপ্নেন্দু হাত মুখ ঘষতেই অনুভব করলো চামড়া উঠে আসছে। উন্মাদের মতো সে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। বিছানাটা গরম কিন্তু আশ্চর্য, পোড়ে নি।

জ্ঞান ফেরার পর স্বপ্নেন্দুর প্রথম খেয়াল হলো সে বেঁচে আছে। আর আশ্চর্য, তার শরীরে সেই প্রচণ্ড জ্বলুনিটা নেই। প্রথমে মনে হলো কাল রাত্রে সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলো। যা শুনেছিলো তা স্বপ্নে! হাতটা মুখে ঘষতে গিয়ে সে চমকে উঠলো। স্পর্শ পাচ্ছে না। হাড়ে হাড়ে যেন সামান্য শব্দ হলো। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো স্বপ্নেন্দু লাফাতে গিয়ে শরীরটাকে এতটা হালকা লাগলো যে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলো। তারপর নিজেকে দেখে চিৎকার করে উঠলো। রাত্রে পাজামা পরে শুয়েছিলো স্বপ্নেন্দু। এখন উঠে দাঁড়াতেই সেটা খুলে পড়ে গেলো। স্বপ্নেন্দুর গলা থকে একটা জান্তব শব্দ বেরিয়ে এলো। পাগলের মতো সে ছুটে গেলো বিশাল আয়নার সামনে। তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো মাটিতে। পড়ে স্থির হয়ে গেলো।

চেতনা ফিরতে স্বপ্নেন্দু আবার উঠে বসলো তার শরীরে কোথাও মাংস নেই, রক্ত নেই, চামড়া নেই। এমনকি শিরা উপশিরা পর্যন্ত নেই। শুধু শরীরে খাঁচাটা আস্ত রয়েছে। আর শুনছে হৃৎপিণ্ডে আওয়াজ। ঘড়ির মতো শব্দ করে চলছে সেটা। স্বপ্নেন্দুর মনে হলো সে দুঃস্বপ্নটা এখনও দেখে যাচ্ছে। একটু একটু করে উঠে দাঁড়িয়ে সে চলে এলো আয়নার সামনে। মেডিক্যাল কলেজ এই রকম কঙ্কাল আয়নায় একটা কঙ্কালের ছবি ফুটে উঠেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ দেখছে কঙ্কালটা। আবার ঠিক কঙ্কালও না! কারণ বুকের খাঁচার মধ্যে ওটা কি। কালচে মতোন একটা হৃদপিণ্ড দেখতে পেলো সে। সে দেখতে পাচ্ছে কিন্তু তার চোখ নেই। ডান হাতটাকে ধীরে ধীরে ওপরে তুলে হৃদপিণ্ডটাকে ছুঁতে যেতে সেটা শব্দ করে উঠলো। সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে বোঝা গেল কালচে হৃৎপিণ্ডটাকে একটা অদৃশ্য কিছু ঘিরে রয়েছে। নিরেট অথবা অদৃশ্য গোলকটির শরীরে আঘাত করলো সে কিন্তু সে একটুও ব্যথা লাগলো না। আয়নার খুব কাছে চলে এলো স্বপ্নেন্দু। একটি পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চির কঙ্কাল তার সামনে দাঁড়িয়ে। তার কোথাও কোথাও কালচে চামড়া আটকে আছে। কিন্তু সামনে রক্তমাংসের চিহ্ন নেই।

চোখের গর্তে গর্ত আছে কিন্তু চোখ নেই। অথচ দেখতে সামান্য অসুবিধে হচ্ছে। সোজাসুজি ছাড়া বাকিটা অদৃশ্য থেকে যাচ্ছে। ডাইনে বাঁয়ে দেখতে হলে মুখ ঘোরাতে হচ্ছে। নাক আছে কিন্তু কোনো ঘ্রাণ শক্তি নেই। জোরে নিশ্বাস ফেললো সে। হৃৎপিণ্ডের আরাম হলো কিন্তু কোনো গন্ধ হলো না।

মুখ হাঁ করলো স্বপ্নেন্দু। জিভ নেই দাঁত আছে। অথচ দাঁতের গোড়ার মাংস না থাকায় সেগুলোকে নগ্ন বীভৎস দেখাচ্ছে। শরীরের নিম্ন অংশের দিকে তাকালো সে তলপেট থেকে দুটো শক্ত মোটা হাড় দুপাশে ছড়িয়ে পা হয়ে নিচে নেমে গেছে। তার যৌন অঙ্গ ইত্যাদির চিহ্নমাত্র নেই।

স্বপ্নেন্দু এইসব ভাবতে ভাবতে কপালে হাত রাখলো। তার মাথার মধ্যে কি চিন্তা করার নার্ভগুলো কাজ করছে ? ব্রেইনবক্স কিংবা ক্রানিয়ামের ভেতরে কি মস্তিষ্ক এটুটু আছে ? নিশ্চয়ই আছে। তার ক্রানিয়াম মস্তিষ্ককে বাঁচিয়ে রেখেছে নইলে সে এতসব ভাবতে পারছে কি করে।

স্বপ্নেন্দু থর থর করে কেঁপে উঠলো। এই কি সে ? এই কালচে শুকনো চামড়া মাঝে মাঝে সেঁটে থাকা কঙ্কাল? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে নিজের মাথাটা দেখতে চেষ্টা করছিলো। হ্যাঁ তাইতো। মা মারা যাওয়ার পর মাথা ন্যাড়া করেছিলো। তখন আয়নার সামনে দাঁড়ালে মাথার আকৃতিটা যেমন দেখতো এখন অনেকটা সেইরকমই লাগছে। তবে আকারে ছোটো হয়ে গেছে কিন্তু আদলটা পাল্টায় নি।

বন্ধ দরজার দিকে তাকালো স্বপ্নেন্দু। তার হঠাৎ খুব ভয় করতে লাগলো সে মরে যায় নি। কিন্তু এইভাবে কঙ্কাল হয়ে বেঁচে থাকার কথা সে কবে শুনেছে। পাঁচজনের সামনে বের হলে কি প্রতিক্রিয়া হবে সবার ? স্বপ্নেন্দুর হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠে কান্নাটা ছিটকে এলো। সামান্য শব্দ হলো কিন্তু এক ফোঁটাও অশ্রু বের হলো না। চোখের জল নেই অথচ আলোড়িত হৃৎপিণ্ড ঠিক কেঁদে যাচ্ছে। শব্দটার কথা খেয়াল হতে সে সচকিত হলো। তার উদর নেই, পাকস্থলী নেই। ধমনী, গ্রন্থি, নালী, পিত্ত, বস্তি, অন্ত্র, যকৃৎ কিছুই নেই। তবু শব্দটা হলো। শব্দটা যে মুখ থেকে বের হয় নি এ ব্যাপারে সে স্থির নিশ্চিত। তাহলে ? বিছানায় এসে বসলো স্বপ্নেন্দু তারপর খুব সন্তর্পণে কথা বলার চেষ্টা করলো 'স্বপ্নেন্দু?' অবিকল নিজের গলাটা শুনতে পেলো সে। শুনতে পেলো কি করে ? তার কি শ্রবণ ইন্দ্রিয় কাজ করছে ? স্বরযন্ত্র যার নেই সে কথা বলে কি করে ? বিশ্বাস হলো না ঠিক, স্বপ্নেন্দু আবার একটু জোরে চিৎকার করে ডাকলো, 'স্বপ্নেন্দু।'

আঃ। সত্যি। সে কথা বলতে পারছে। স্বপ্নেন্দু বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করতে গিয়ে খেয়াল করলো তার অক্ষিগোলক নেই তাই চোখের পাতা থাকার কথা নয়। তার মানে কখনও ঘুমুতে পারবে না সে। ঘুমুতে পারবে না, কিন্তু কথা বলতে পারবে। আচ্ছা, তার কথা কি সামান্য নাকি শোনাচ্ছে! ছেলেবেলায় গল্পের বইতে কঙ্কালদের যেরকম চন্দ্রবিন্দু দিয়ে কথা বলতে দেখতো সেইরকম ? সে আর একবার শব্দ করলো। খুব স্বাভাবিক শোনাচ্ছে না স্বর। প্রথমবার আনন্দে ঠাওর হয় নি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে নাকি ভাবটা আছে। কিন্তু স্বরটা বের হচ্ছে কোত্থেকে ? দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করতে গিয়ে স্বপ্নেন্দুর কাছে ধরা পড়লো। ওই প্রচণ্ড শক্ত অথচ অদৃশ্য গোলাকার বস্তুটি যা বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ডটাকে আড়াল করে রেখেছে, শব্দটা আসছে ওর ভেতর থেকে। সে কি শুনতে পাচ্ছে ওই গোলকটির কারণে ? মাথাটাকে যতটা সম্ভব বুকের কাছাকাছি নামিয়ে সে কথা বললো। হ্যাঁ, এটাই সত্য। তার শরীরটাকে সচল রাখার সমস্ত জাদু ওই অদৃশ্য গোলকের মধ্যে রয়েছে। শরীর বলতে শুধু এই হাড়গুলো অত্যন্ত যত্নে সে গোলকটির গায়ে হাত বোলালো। তারপর গুনগুন করে উঠলো, 'এই, আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'। কি চমৎকার! তার স্বরে সুর আছে। একেই তো গান বলে। অথচ এতকাল সে একটা লাইনও সুরে গাইতে পারে নি।

সারাটা দিন স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে কাটিয়ে দিলো স্বপ্নেন্দু। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে চিৎকার কান্না ভেসে আসছে! ব্যাপারটি কি জানার জন্যে তার কৌতূহল হলেও সে বিছানা ছাড়লো না। নিজের অতীতের শরীরটার জন্যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো। তার দাড়ি কামাতে খুব বিরক্ত লাগতো একথা ঠিক, কিন্তু কামানো হয়ে গেলো গালটা কি নরম লাগতো! চিবুকের কাছটা কি আদুরে ছিলো। শরীরের বিভিন্ন অংশের ছবি একটু একটু করে মনে পড়ায় স্বপ্নেন্দু আরও ভেঙে পড়লো। এত বছর ধরে সযত্নে লালিত শরীরটা আজ এক লহমায় উধাও, এখন শুধু একটা কঙ্কাল তার পরিচয়। কিছুক্ষণ কাটা ছাগলের মতো ছটফট করলো সে। তারপর নেতিয়ে রইলো বিছানায়।

ওরা জায়গা করে দিলে স্বপ্নেন্দু বেঞ্চিতে বসলো ? সন্ধ্যে হয় গেছে। কিন্তু চারধার অন্ধকারে ঢেকে যায় নি। রাস্তার আলোগুলো জ্বলছিলো। স্বপ্নেন্দু বুঝলো কাল রাত থেকেই জ্বলছে। আজ সকালে নেভানো হয় নি। সে আড়চোখে লোকগুলোর দিকে তাকালো। প্রত্যেকের বুকের খাঁচায় কালচে হৃৎপিণ্ড দেখা যাচ্ছে। একজন অন্যমনস্ক হয়ে সেখানে হাত দিতে গিয়ে বাধা পেলো। অর্থাৎ সেই অদৃশ্য নোণকে প্রত্যেকেরই হৃৎপিণ্ড আবদ্ধ। এক একজনের মাথার করোটিও এক একরকম। কোন্‌টা বেশি লম্বা,কোন্‌টা সামনের দিকে ছুঁচলো। মুখের হাড়ের গঠনের বনমানুষের স্পষ্ট ছাপ। অবনীদার মুখে বেশগরিলা গরিলা ভাব আছে। তবে প্রত্যেকের করোটি বেশ মোটা।

স্বপ্নেন্দু দেখলো চায়ের উনুনে আঁচ পড়ে নি। জিনিসপত্র চারপাশে অবহেলায় জড়ানো। সে জিজ্ঞাসা করলো, 'অবনীদা, আপনার দোকানের ছেলেটা আসে নি ?'

'এসেছিলো।' মাথা নাড়লো, অবনীদা, 'আর ওকে দিয়ে আমার কি হবে। ওই উনুন ধরিয়ে আর কি হবে। চা খাওয়ার মানুষ কোথায় আমি একেবারে শেষ হয়ে গেলাম ভাই। ধনেপ্রাণে শেষ।'

এক ব্যক্তি বললো, 'মানুষ কাজ করে পেটের জন্যে। সেই প্রয়োজন না থাকলে কি হবে কাজ করে। এ দায় থেকে বাঁচা গেলো।'

'যা বলেছেন। আজ সারাদিন কিছুই খাই নি। অথচ দেখুন, আমার একটুও খিদে পাচ্ছে না। অথচ আমার পেটে আলসার ছিলো। ডাক্তার বলেছিলেন নিয়ম করে খেতে। একদম যেন খালি পেটে না থাকি। তা পেটই যখন নেই।'

এই সময় তৃতীয়জন হেসে উঠলো। সামান্য শব্দ হলো। স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে লোকটাকে দেখালো সম্পূর্ণ উলঙ্গ। এই অবস্থায় কোনো মানুষ হাসতে পারে! আমাদের সব গিয়েছে কিন্তু প্রাণ এবং কঙ্কালটা আছে। তাই কিভাবে হাসি আসে? হাসির যদি অপব্যবহারও হয়ে থাকে তাহলেও হাসি ইজ হাসি। তবু লোকটার দিকে তাকিয়ে তার অস্বস্তি হচ্ছিলো। সে শান্ত স্বরে বললো, 'আপনার একটা পোশাক পরা উচিত ছিলো।'

'উচিত ছিলো ?' লোকটা আবার খুক খুক করে হাসলো, 'কেন উচিত ছিলো ?'

'পোশাক পরা কেনো উচিত ছিলো তাই জিজ্ঞাসা করছেন?'

আগে করতাম না। এখন করছি। এখন আমার কোনো গোপন অঙ্গ নেই যে তাকে ঢেকে রাখবো। এখন শীতকাল নয় যে হাড় কনকন করবে ঢেকে না রাখলে। গরমের সময় খোলাখুলি থাকলে আরাম হবে। হাওয়া এপাশ থেকে ওপাশ বইলে হাড় জুড়োবে। আপনি বললেই আমাকে শুনতে হবে ?' খুক খুকিয়ে হাসলো লোকটা।

অবনীদা বললো, 'অরবিন্দ, তুমি যা বললে তা' খুব মিথ্যে নয়। তবে কিনা চোখেরও তো একটা ব্যাপার আছে। দেখতে বড় খারাপ লাগে।'

সে আলাদা কথা। উনি উচিত বলছেন। উচিত বলার কি ? মুখ্যমন্ত্রী নাকি?'

স্বপ্নেন্দু বললো, 'মুখ্যমন্ত্রী বললে শুনতেন ?'

'এই দ্যাখো আমরা এখানে কি জন্যে বসে আছি? মুখ্যমন্ত্রী সাতটার সময় রেডিওতে কিছু বলবেন বলেই তো। আমরা তো তাঁর কথা শুনবে।

স্বপ্নেন্দু আর কথা বাড়ালো না। এক একটা লোক থাকে ঝগড়াটে টাইপের। যে কোনো ছুতো পেলে তাদের জিভ লকলকিয়ে ওঠে। এতবড় একটা পরিবর্তন হয়ে গেলো তবু লোকটার স্বভাব পাল্টালো না।

স্বপ্নেন্দু আবার লোকগুলোর দিকে তাকালো। সম্পূর্ণ ভৌতিক দৃশ্য। একাদন আগে হলে তবু লোকটার এই রকম চেহারার সঙ্গে বসে আছে ভাবলে বুক শুকিয়ে যেত। এই

সময় অবনীদা রেডিওটাকে খুলে দিলেন। সেই কু শব্দ শুরু হয়েছে। এখন চুপচাপ চারধার। গরম বাতাসটা থেমে গেছে। রেডিওর স্টেশন শুরু হওয়ার সিগন্যালটা বন্ধ হয়ে পুরুষকণ্ঠ শোনা গেলো, 'আকাশবাণী কলকাতা। বিশেষ ঘোষণা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গতকাল থেকে আকাশবাণীর নিয়মিত অধিবেশন বন্ধ রাখতে হয়েছিল বলে আমরা দুঃখিত। এখন সমস্ত কলকাতাবাসীর কাছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ বক্তব্য রাখবেন।' কয়েক সেকেণ্ড নীরবতার পর মুখ্যমন্ত্রীর পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'বন্ধুগণ। আমরা অভূতপূর্ব একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছি। পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও এমন ঘটনার কথা এর আগে শোনা যায় নি। গতকার রাত সাড়ে দশটার সময় হঠাৎ দূর মহাকাশের একটি নক্ষত্র স্থানচ্যুত হয়। তারই আকর্ষণে পৃথিবীর একাংশে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। আমাদের দুর্ভাগ্যের কিংবা সৌভাগ্যের বিষয় সেই একাংশটি হলো কলকাতা শহর। হঠাৎ বাতাস উত্তপ্ত হয়। এবং পরমাণু বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া অথবা আগ্নেগিরি থেকে উদ্ভুত লাভার মতো একটি হাওয়া কলকাতার ওপর বয়ে যাওয়ায় মানুষের শরীর থেকে রক্ত মাংস ধমণী অদৃশ্য হয়ে যায় শুধু মানুষ নয়, কলকাতার যত পশু-পাখি ছিলো তাদেরও এই হাওয়ার শিকার করে। মানুষ এবং সুগঠিত প্রাণীরাই শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকতে পেরেছেন। সেই সময় চালু থাকা কিছু ক্যামেরায় অদৃশ্য লাভার রঙ ছিলো কালো।

মাত্র আধঘন্টা ওই লাভাস্রোতের স্থায়িত্ব কিন্তু তার মধ্যেই আমাদের পরিচিত মানবীয় চেহারা লুপ্ত হয়। কলকাতার চৌহদ্দিতে যত গাছপালা ফুলের বাগান এবং ঘাস ছিলো সব ছাই হয়ে যায়। এই মুহূর্তে আমরা বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি আমাদের বিজ্ঞানীদের বলেছি তাঁরা যেন অবিলম্বে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি তাদের এও বলেছি প্রাকৃতিক পরিবর্তনের হেতু আমাদের শারীরিক পরিবর্তন হয়েছে। কোনো অবস্থায় আবার আগের চেহারায় আমরা ফিরে যেতে পারি কি না।

বন্ধুগণ! আমি জানি এই পরিবর্তন মেনে নেয়া খুব কঠিন এতদিন আমরা যে শরীর দেখে অভ্যস্ত হয়েছি তার ব্যতিক্রম অবশ্যই পীড়া দেবে। কিন্তু জনসাধারণকে অনুরোধ করছি এই যে পরিবর্তন ঘটে গেলো তা আপাতত অনেকগুলো সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে। প্রথমত, খাদ্যবস্তুর অভাব আমরা অনুভব করবো না। পৃথিবীতে আমরা জন্ম গ্রহণ করি এবং জীবিত থাকি কিছু কাজ করবার জন্যে। যা দেশের উপকারে লাগে এবং মনের শান্তি হয় কিন্তু এতদিন আমরা শরীর টিকিয়ে রাখতে অনেক বাজে সময় ব্যয় করতাম। খাদ্য উৎপাদন এবং সমগ্র সেই খাদ্যকে পরিপাকের উপযোগী করে নিতে অনেক সময় এবং অর্থ নষ্ট হতো। এখন আমাদের আর এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। এ মুহূর্তে আমাদের হাতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ এবং আধুনিক জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু মজুত আছে। আমি কলকাতাবাসীর কাছে আন্তরিক আবেদন করছি তারা যেন অবিলম্বে স্বাভাবিক কাজকর্মে যোগ দেন। যে যা করছিলেন এতকাল আগামীকাল থেকেই সেই সব কাজ শুরু করেন। শারীরিক পরিবর্তনের কারণে যারা কর্মচ্যুত হবেন সরকার তাঁদের সমস্ত দায়িত্ব নেবে। আমরা স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছি, আপনারা সাহায্য করুন। কাল থেকে যে যার কাজে যোগ দিন।

বন্ধুগণ, প্রথমেই আমি বলেছি কলকাতা দুর্ভাগ্য কিংবা সৌভাগ্যের অধিকারী। কেনো সৌভাগ্য তা ব্যাখ্যা করা দরকার। এতকাল এই যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এবং সামাজিক পরিবেশে আমরা অনেক কাজ ইচ্ছে থাকলেও করতে পারি নি। আমরা একটা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু পরিস্থিতি আমাদের অনেক দূরে থাকতে বাধ্য

করেছিলো। গতরাত্রে আমরা সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছি। শারীরিক পরিবর্তন আমাদের কি কি সুবিধে এনে দেবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়েও প্রধান কয়েকটি কথা জানাচ্ছি। এখন থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো শারীরিক পার্থক থাকবে না। কালার প্রবলেম বা গায়ের চামড়ার পার্থক্যপ্রসূত যে ব্যবধান তা দূর হবে। কলকাতার মানুষের চেহারা এক হয়ে যাওয়ায় কোনো সাম্প্রদায়িক সংঘাত হবে না। খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। তাছাড়া অর্থনীতির নানান পরিবর্তন আসতে বাধ্য।

বন্ধুগণ! কেউ কেউ আমার কাছে আর একটি বিষয়ে আশংকার কথা ব্যক্ত করেছেন। শারীরিক পরিবর্তনের কারণে মানুষের প্রজনন ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ায় আমাদের বংশধররা পৃথিবীতে আসবে না। এর ফলে কলকাতাবাসীরা একদিন লুপ্ত হবে। কিন্তু আমি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা আমাকে জানিয়েছেন বিপ্লব আমাদের যা দিতে পারতো না এই লাভাস্রোত তা আমাদের দিয়েছে। আমরা এখন অমৃতের সন্তান। মৃত্যুর কালো হাত আর আমাদের স্পর্শ করবে না। আমরা অমর। যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন আমরা বেঁচে থাকবো। এই মহান সম্মানের অধিকারী হওয়া যে সত্যি সৌভাগ্যের সেকথা বলাই বাহুল্য। তবু আমি বিজ্ঞানীদের অনুরোধ করেছি তারা গবেষণা করুন। এমন একটা আবিষ্কার করুন, কলকাতাবাসীরা প্রজনন ক্ষমতার অধিকারী হয়। আপনারা স্মরণ করুন, একদিন আগেও আমরা জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রচার চালিয়ে এসেছি। ওই লাল ত্রিকোণ চিহ্নের কোনো প্রয়োজন আর আমাদের নেই। অতএব আমরা আবার জনসাধারণকে অনুরোধ করছি অবিলম্বে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনুন। নমস্কার।'

এরপরেই ঘোষকের স্বর শোনা গেলো, 'এতক্ষণ কলকাতাবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্র-সুর বাজানো হচ্ছে। স্বপ্নেন্দু উঠে দাঁড়ালো। রেডিওতে তখন বাজানো হচ্ছে, 'হে নূতন, দেখা দিক আর বার।'

অবনীদা করেটি ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'চললে?'

অরবিন্দ নামক লোকটা বললো, 'তুমি তো দেখছি সত্যি ভালো মানুষ। আরে তোমার উনুন ধরানোর কি দরকার? খাওয়া দাওয়ার চিন্তা নেই। পায়ের ওপর পা তুলে দিনরাত গপ্পো করবো। এই উনুনটা ভেঙে ফেলে এখানে আরো আড্ডা মারার জায়গা করো।

'তোমার তো খাটুনি বেঁচে গেলো।'

'দিনরাত গপ্পো করবো? আমার তো সময় কাটবে না।'

স্বপ্নেন্দু বেরিয়ে এলো। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের প্রতিক্রিয়া কিনা কে জানে তবে এখন রাস্তায় নরকঙ্কাল দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ কাঁদছে। কিন্তু বাকিরা খুব ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে। এইসব কঙ্কালেরা পোশাক পরেছে এলোমেলো ভাবে। বিছানার চাদর কোমরে জড়িয়ে নিয়েছে কেউ। স্বপ্নেন্দু লক্ষ্য করলো কোনো মহিলা কঙ্কাল নেই রাস্তায়। একটি শিশু কঙ্কালকে বুকের কাছে নিয়ে কুঁজো হয়ে যাওয়া একটি কঙ্কাল ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ছে। স্বপ্নেন্দুকে দেখে লোকটা জিজ্ঞাসা করলো, 'আমি কি রক্ত মাংসের মানুষ?'

স্বরে বোঝা গেলো লোকটা বৃদ্ধ। উত্তর না দিয়ে স্বপ্নেন্দু মাথা থেকে চাদরের আড়ালটা সরিয়ে দিতে বৃদ্ধা মাথা নাড়লো, 'ওঃ একই অবস্থা। সব মানুষের একই হাল। এ যে নরক হয়ে গেলো।'

'নরক বলছেন কেনো ? মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শোনেন নি ?'

'শুনেছি। কিন্তু তাতে কি মন মানে? দুদিন আগে আমার বউ মারা গেছে। কি সৌভাগ্যবতী ছিলো সে। রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চিতায় চড়ে গেলো। বুড়োর স্বরে কান্না মিশলো।

'কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বললেন আমরাই একমাত্র সৌভাগ্যবান।'

'সৌভাগ্য ? কি জানি।'

'আজকে আপনার শরীরের কি পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন?'

বৃদ্ধ এবার হাসলেন, 'তা হয়েছে বইকি। প্রসাব করতে খুব কষ্ট হতো। সেটা দূর হয়েছে। হাঁটতে গেলে পায়ের শিরায় টান ধরতো, এখন হচ্ছে না।'

'তাহলে বলুন, আপনি অনেক ভালো আছেন।'

'আমার কথা ছেড়ে দাও! এই বাচ্চা। মোটে একবছর বয়স। এখনও ভালো করে হাঁটতে পারে না। এর কি হবে ? এ কি কখনো বড়ো হবে ?'

স্বপ্নেন্দু বললো, 'আমি জানি না।'

আর হাঁটতে তার ভালো লাগছিলো না। শরীর যদিও হালকা তবু হয়তো অনভ্যাসে ক্লান্তি লাগছিলো। স্বপ্নেন্দু বাড়িতে ফিরে এলো। পায়ের তলাটা বেশ টনটন করছে। তার মানে এতকাল চামড়া এবং মাংস যে আড়াল রেখেছিলো তা না থাকায় ব্যথা হয়েছে।

ঘরে ঢুকে পাঞ্জাবিটা খুলতেই মন খারাপ হয়ে গেলো আবার। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো সে। এই কাঠামোটা তার ? অথচ এতকাল এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সে সজাগই ছিলো না। স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হলো তার হাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে কালচে পোড়া চামড়া গেলে আছে। এগুলো পরিষ্কার করে ফেললে ভালো হয়। বাথরুমে ঢুকলো সে। কল খুলতে অবাক হলো সে। জল নেই। এক ফোঁটা জল বের হলো না। এই বাড়ির ছাদে একটা ট্যাঙ্ক আছে। সারা দিনরাত জলের আজ পর্যন্ত কোনো অভাব হয়নি। তারপরেই মেরুদণ্ডের হাড় কেঁপে উঠলো কলকাতা শহরের সমস্ত জল গতকালের প্রতিক্রিয়ায় উধাও হয়ে যায় নি তো! জল ছাড়া কি চলছে। মুখ্যমন্ত্রী একবারও এ বিষয়ে কিছু বললেন না। জল হলো জীবন, কলকাতায় যদি জল না থাকে-! নিজেকে গালাগাল দিলো সে। এখনও উল্টোল্টা ভেবে যাচ্ছে। কলকাতার মানুষের আর জলের প্রয়োজন নেই। এখন যে শরীর নিয়ে তাদের বেঁচে থাকতে হবে জল তার কোনো কাজেই লাগবে না। তোয়ালে দিয়ে শরীরটাকে পরিষ্কার করলো সে। ক্রমশ হাড়গুলোর চেহারা পাল্টে যেতে লাগলো। বেশ তকতকে দেখাচ্ছিলো সেগুলো। আয়নার সামনে এসে দাঁড়াতেই নিজের শরীরটাকে একটু পছন্দসই বলে মনে হলো। আর তখনই সুজিতের কথা মনে পড়লো। সুজিত গতকাল ফোন করে বলেছিলো আজকে সন্ধ্যায় যেন সে যায়। এই চেহারা নিয়ে যাওয়া যায় ? তাছাড়া সুজিত, সুজিতের কি অবস্থা? ও তো নামকরা চিত্রাভিনেতা। পাশের ঘরে টেলিফোন। খুব সন্তর্পণে ডায়াল করলো স্বপ্নেন্দু। এটা এখন কাজ করছে কিনা কে জানে। কিন্তু ডায়াল টোন ছিলো যখন, স্বপ্নেন্দু শুনলো ওপাশে রিং হচ্ছে। তারপরেই সুজিতের নার্ভাস স্বর কানে এলো, 'হ্যালো।'

'সুজিত? আমি স্বপ্নেন্দু।'

'ওঃ!'

'তুমি কেমন আছো?'

'আমি? আমি শেষ হয়ে গেছি। কমপ্লিট ব্রোক। আয়নার সামনে দাঁড়াতে পারছি না। কি ভয়ঙ্কর। আমি এখন কি করবো ? ঘরের দোল জুড়ে আমার যে সুন্দর ছবি সেদিকে তাকালে বুক জ্বলে যাচ্ছে। কেউ আর আমার দিকে ফিল্ম অ্যাক্টর বলে তাকাবে ? জানলা দিয়ে দেখলাম রাস্তার মানুষজন আমারই মতো দেখতে। এমনকি আমার চাকরটার সঙ্গেও কোনো পার্থক্য নেই।'

'মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বিপ্লবও এতটা সাফল্য আনতো না।

'রেখে দাও বিপ্লব। এখন আর টালিগঞ্জে কাজ হবে ভেবেছ। আমি আজ সারাদিন আমাদের লাইনের সবাইকে কন্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করেছি। তুমি জানো মিস মিত্র আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন!'

'মিস মিত্র?'

ওঃ তুমি সিনেমা দ্যাখো না নাকি ? বাংলার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নায়িকা। কিন্তু গলায় দড়ি দেয়া সত্ত্বেও মৃত্যু হয় নি। শুধু ঘাড়ের হাড় ভেঙে যাওয়ায় মাথাটা হেলে রয়েছে! এ কি হলো স্বপ্নেন্দু?'

'জানি না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন মেনে নিতে।'

'তোমাদের আর কি। এসব এখন বলতে বাধা নেই। দেহপট সনে নট সকলই হারায়। উঃ, ভগবান,কি যে করি!'

'তোমার ওখানে আজ আমার-'

'সে সব ক্যানসেল্ড। ইয়ার্কি হচ্ছে ? আমার ফ্রিজে গাদাগাদা খাবার। কালকে তিনটে রয়্যাল স্যালুট এনেছিলাম। সবচেয়ে দামী হুইস্কি। সব চোখের সামনে অথচ আমি খেতে পারছি না।' ওপাশে সজোরে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ পেলো স্বপ্নেন্দু।

এই প্রথম তার হাসি পেলো। মিস মিত্র আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেও পারে নি! মিস মিত্র সত্যিই সুন্দরী আর তখনই ওর মনে হেনা সেনের মুখ ভেসে উঠলো আজ সারাদিন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলো যে হেনার কথা মনেই পড়ে নি। হেনা কেমন আছে? সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো স্বপ্নেন্দু। সেই লোভনীয় শরীর আর তার চলনের ভঙ্গিটা চোখের সামনে দেখতে পেলো। না হতে পারে না। হয়তো হেনার ওদিকে অদৃশ্য লাভার স্রোত বয়ে যায় নি। হেনার তীক্ষ্ণ অথচ দীঘির মতো ভারী বুক এবং নিতম্ব, চোখের কারুকাজ স্বপ্নেন্দুর মাথায় কিলবিল করতে লাগলো আর তারপরেই একটা ভয় হৃৎপিণ্ডটাকে আঘাত করলো। যদি হেনা সেন আক্রান্ত না হয়, যদি তার শরীর এখনও আগের মতো মাদকতা জড়ানো থাকে তাহলে? স্বপ্নেন্দু ঝিম হয়ে বসে রইলো। না, তা হতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কলকাতার ওপর দিয়েই সেই অদৃশ্য লাভা স্রোত বয়ে গিয়েছে। হেনা সেন কোনেভাবেই বেঁচে যেতে পারে না। ঠিক হলো না কথাটা, হেনা সেনের আগের শরীরটা অটুট থাকতে পারে না। যদি হেনা সেন আগের মতো থাকে তাহলে সে কখনও তার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। রক্তমাংসের ওই সুন্দরী কখনই একটি জীবন্ত কঙ্কালকে চোখে চেয়ে দেখতে পারবে না। ঘৃণা এবং ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবে। স্বপ্নেন্দু স্পষ্ট অনুভব করলো তার হৃৎপিণ্ড কাঁপছে। হেনা সেনের জন্যে অদ্ভুত একটা আকর্ষণবোধ করছিলো সে। ঈশ্বর নিশ্চয়ই এতটা কঠিন হবেন না। ওই অদৃশ্য লাভাস্রোত নিশ্চয়ই হেনার বাড়ির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। এখন এই রাত্রে কিছু জানবার উপায় নেই। ওর বাড়িতে টেলিফোন আছে কিনা তা জানে না স্বপ্নেন্দু। কাছাকাছি হলে না হয় হেঁটে যাওয়া যেতো।

ভীষণ কাহিল লাগছিলো। আলোটা নেভাতে গিয়ে থমকে গিয়ে দাঁড়ালো সে। তার হৃৎপিণ্ড আবার কাঁপছে। শরীর স্থির। তারপর পায়ে পায়ে সে এগিয়ে গেলো টেবিলের কাছে। কাঁচের বাতিটা টকটকে লাল হয়ে গেছে। উল্টো করে বসানো বাটিটার মধ্যে সেই লাল গোলাপটা এখন আরও জীবন্ত দেখাচ্ছে। আরো টাটকা। এমনকি ওর নিটোল নরম পাপড়ির গায়ে সেই জলের ফোঁটাও চকচক করছে। লোভীর মতো ফুলের দিকে তাকিয়ে রইলো স্বপ্নেন্দু। কি উদ্ধত ভঙ্গী রক্ত গোলাপটার। হাত বাড়ালো সে। কিন্তু তারপরেই কথাটা খেয়াল হলো। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কলকাতার কোনো গাছ কিংবা বাগান যদি বেঁচে না থাকে, মাঠের ঘাসগুলো যদি শুকিয়ে ছাই হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এই লাল গোলাপটা এখনও এমন গর্বিত ভঙ্গিতে বেঁচে আছে কি করে ? স্বপ্নেন্দুর মনে হলো হয়তো সমস্ত কলকাতায় এই একটি মাত্র জীবিত ফুল। যদি ওটা কোনো ফুলদানি কিংবা টেবিলে খোলা থাকতো তাহলে আজ সকালে ছাই হয়ে যেত। কিন্তু কাঁচের পাত্রের নিশ্ছিদ্র আড়াল

ফুলটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এবার প্রচণ্ড লোভীর মতো মাথাটাকে কাঁচের বাটির গায়ে নিয়ে গেলো সে। পাপড়ির শরীরের কোষগুলোকে যেন অনুভব করতে পারছে সে। এই কলকাতার কোথাও এই মুহূর্তে আর কোনো উদ্ভিদ নেই শুধু এই ফুলটি ছাড়া। কিন্তু কদিন এ এই রকম থাকবে? আস্তে আস্তে তো শুকিয়ে মরে যাবেই। স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়লো। না, কাল রাত্রেই ওই ভয়ঙ্কর ঘটনার পরও যখন বেঁচে আছে তখন নিশ্চয়ই অনেককাল অটুট থাকবে। ওই কাঁচের বাটিটাকে সরালে চলবে না। কোনো অবস্থায় ওই বাটিতে হাত দেবে না সে। তাহলে ফুলটা বেঁচে থাকবে। ওকে যেভাবেই হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। স্বপ্নেন্দু কাঁচের বাটিটার দিকে তাকালো। খুব জোর হাওয়া বইলে কি ওটা উল্টে যাবে ? ঠিক ভরসা হয় না। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো। তারপর আর একটা কাঁচের বড় জার এনে সেটাকে উল্টে বাটিটাকে চাপা দিলো সন্তর্পণে যাতে দুটোয় ছোঁয়া ছুঁয়ি না হয়ে যায়। তারপরে সে ফিরে এলো বিছানায়। দুটো কাঁচের আড়ালে থাকলেও ফুলের লালরঙটা বোঝা যাচ্ছে। স্বপ্নেন্দুর সেই রূপকথার গল্পটা মনে পড়লো। গভীর সমুদ্রের নিচে একটা ঝিনুকের বুকে কারোও প্রাণ লুকোন ছিলো। মনে হলো ওই দুই কাঁচের পাত্রের আড়ালে জীবন্ত ফুলটা তার প্রাণ-কারণ ওটার দিকে তাকালেই হৃৎপিণ্ডটা অন্তত শান্ত হয়ে যায়। কোনো চিন্তা মাথায় আসে না, শুধু একটা ভালো লাগায় বিভোর হতে হয়।

কাল সারাটা রাত ঘুম আসে নি। চেষ্টা করেছে স্বপ্নেন্দু, বিছানায় নিথর হয়ে পড়ে থেকেছে। কিন্তু ঘুমুতে পারে নি। তার চোখের পাতা কিংবা অক্ষিগোলক নেই। শোওয়া অবস্থায় সবসময় ঘরের ছাদটায় দৃষ্টি আটকে থেকেছে। এই দৃষ্টি বন্ধ করার কোনো কায়দা তার জানা নেই। শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে পরিবর্তিত অবস্থায় তাদের ঘুম আসবে না। ঘুম প্রয়োজন শরীরের। ঘুমন্ত অবস্থায় হৃৎপিণ্ড কাজ করে যায়। তাই শরীর যদি না থাকে তাহলে ঘুমের কি দরকার। অতএব খাবার জল ইত্যাদির মতো ঘুমও তার জীবন থেকে চলে গেলো।

মাঝরাত্রে খুব অস্বস্তি হচ্ছিলো। সে সারাজীবন ঘুমাতে পারবে না এটা চিন্তা করতেই অস্বস্তিটা বেড়ে যাচ্ছিলো। অন্যমনস্ক স্বপ্নেন্দু পাশ ফিরে তাকাতেই সেই গোলাপের রঙটা দেখতে পেলো। আর অমনি তার চিন্তা স্থির হয়ে মিলিয়ে গেলো। সে লক্ষ্য করেছে বেশি উত্তেজিত হলে হৃৎপিণ্ড কাঁপে। ফুলটার দিকে তাকালে সেই কাঁপুনি থেমে যায়। সুন্দর শান্তিতে রাতটা কেটে গেলো, ঘুম নেই, কিন্তু ফুলটার দিকে তাকিয়ে থেকে তার একটুও কষ্ট হচ্ছিলো না সকালে।

আজও ছুটি। তার কিছুই করবার নেই। রেডিওটা খুলতেই বাজনা শুনতে পেলো। আর মাঝে মাঝেই সরকারের পক্ষ থেকে কলকাতাবাসীদের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালু করার জন্যে। খবর শুনলো সে। আজ সকালে ট্রামবাস আগের মতো চলতে শুরু করেছে। কলকাতার মানুষ দলে দলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছে তাঁরা ওই ঘটনার প্রাথমিক আঘাত খুব দ্রুত কাটিয়ে উঠেছেন। আজ ছুটির দিন। মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করেছেন কাল থেকে সবাই যেন নিয়মিত অফিস কাছারিতে যোগ দেন।

দুপুরে বাড়ি থেকে বের হলো স্বপ্নেন্দু। সেই পাজামা পাঞ্জাবি এবং চাদর জড়িয়ে। আর রাস্তায় অনেক লোক। স্বপ্নেন্দুর ভালো লাগলো প্রত্যেকেই যে যার মতো পোশাক পরেছে। ট্রামে স্টপেজের কাছে আসতেই সে একটা স্বর শুনতে পেলো, ' এই যে দাদা, খুব শীত নাকি ?'

সে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে দেখতে পেলো চারটি মাঝারি সাইজের কঙ্কাল একটা রকে বসে আছে। প্রত্যেকের পরনে চাপা প্যান্ট এবং রঙিন জামা। করোটির দিকে বোঝা যায় ওদের বয়স খুব বেশি নয়। সে দেখছে বুঝে একজন বললো, 'অত লজ্জা কেন? আপনার মাথা কি আলাদা ? খুলে ফেলুন খুলে ফেলুন। পাঁচজনে দেখুক।'

আর একজন পিনিক কাটলো, 'যেন লজ্জাবতী বউ।'

স্বপ্নেন্দুর চোয়াল শক্ত হলো। এরা যে রকবাজ তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না! সামনে বস্তির কিছু ছেলে এখানে এসে বসে আড্ডা মারে, খিস্তি করে, প্রয়োজনে বোমাটোমাও ছোঁড়ে। এই দলটা তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এখন সে কিছুই করতে পারে না। এই শরীর নিয়ে মারামারি করার কথা চিন্তা করাও যায় না। কিন্তু এত কাণ্ডের পরও ওরা ওদের স্বভাব ত্যাগ করতে পারে নি সেটাই আশ্চর্যের কথা। এই জেনারেশনের ছেলেগুলো কোনো কিছুতেই রিঅ্যাক্ট করে না ? তার মনে হলো, ওরা আগের মতোই আছে, হয়তো ভালোই আছে।

ধর্মতলায় ট্রাম আসছিলো। স্বপ্নেন্দু লক্ষ্য করলো ড্রাইভারের শরীরে ওভারকোট, মাথায় মাফলার জড়ানো। কিন্তু লোকটা যে কঙ্কাল তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। লোকটা নিশ্চয়ই তারই মতো। নইলে এই গরমে ওসব জড়িয়ে বের হয়। ট্রামটা থামতে, উঠে পড়লো স্বপ্নেন্দু। বিভিন্ন সাইজের কঙ্কাল সিটগুলো ভরে আছে। কিছু দাঁড়িয়ে। বোঝা যাচ্ছে ছুটির দিন সবাই কলকাতার নতুন চেহারা দেখতে বেরিয়েছে। এবং তখনই তার চোখে পড়লো লেডিস সিটে দুজন মহিলা বসে আছেন। মহিলা, তার কারণ ওঁদের পরনের শাড়ি ব্লাউজ। আঁচল ঘোমটার মতো মাথায় জড়ানো। স্বপ্নেন্দুর হৃৎপিণ্ড থরথরিয়ে উঠলো। মুখের দিকে না তাকালে কেমন ছ্যাঁক করে ওঠে। সে আরও একটু সরে এলো। লেডিস সিটে কিছু জায়গা খালি আছে। যারা দাঁড়িয়ে তারা ইচ্ছে করেই বসে নি। সে দুই মহিলার মুখের দিকে তাকালো। গোলগাল ছোট্ট করোটি। নাক এবং গালের হনুতে স্পষ্ট পার্থক্য আছে পুরুষদের সঙ্গে। হাতের হাড় সরু সরু। দেখলেই বোঝা যায় খুব পলকা শরীর। পাশে দাঁড়ানো একজন বললো, 'বসতে চান বসে পড়ুন। লেডিস উঠলেই হয়ে যাবে।'

একজন মহিলা সেকথা শুনে মুখ তুলেই ফিরিয়ে নিলেন! এর নাকের ডগাটা বসা, কপাল উঁচু। কোনো মেয়ের চেহারা এত বীভৎস হতে পারে? মনে হতেই হেসে ফেললো স্বপ্নেন্দু। রাস্তায় বের হলেই বোঝা যাচ্ছে পুরুষরাও কতখানি কুৎসিত দেখতে। এতকাল মাংস চামড়া এবং রঙ প্রত্যেকের খামতি আড়াল করে রাখতো।

আজকাল কলকাতার কোনো দোকানপাট খোলে নি। ধর্মতলাটা ছুটির দিনে যেমন তার থেকেও বেশি খাঁ খাঁ। যেন হরতাল হয়ে গেছে। শুধু কাতারে কাতারে মানুষ উৎসুক হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। বাস চলছে গোটা কয়েক। কিন্তু প্রাইভেট গাড়ি চোখে পড়লো বেশ কিছু। যারা চালাচ্ছে তাদের ভঙ্গী ঠিক আগের মতোনই। ট্যাক্সি একটাও বের হয় নি রাস্তায়।

গড়ের মাঠের অবস্থা খারাপ হয়েছিলো পাতাল রেলের কল্যাণে। এখন তো তাকানোই যায় না। সব ঘাস উধাও হয়ে ন্যাড়া হয়ে গেছে চারধার। গাছগুলো পর্যন্ত পোড়া কয়লা। ইডেন গার্ডেন একটা পোড়া বাগানের চেহারা নিয়েছে। আরও কয়েক পা হাঁটার পর চমকে উঠলো স্বপ্নেন্দু। গঙ্গায় এক ফোঁটা জল নেই। চাপ চাপ শক্ত কাদার ওপর মৃত জলচর প্রাণীর হাড় ছড়িয়ে আছে। নদীর কঙ্কালটাকে বীভৎস দেখাচ্ছিলো। লঞ্চ এবং জাহাজগুলো নদীর কাদায় আটকে রয়েছে। জল নেই, কথাটা মনে পড়লো। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বহির্জগতের সঙ্গে কলকাতা বিচ্ছিন্ন। তাহলে এই গঙ্গার শেষ যেখানে সেখানে কি আছে? স্বপ্নেন্দুর মাথায় ঢুকছিলো না নিশ্চয়ই গোটা সমুদ্রটা উধাও হয়ে যায় নি। অবশ্য কলকাতার বাইরে।

সারাদিন স্বপ্নেন্দু ঘুরে বেড়ালো। মানুষের আচরণ এখন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তবে রাস্তাঘাটে বিভিন্ন সাইজের কঙ্কালের অকারণ ভিড়। তালতলায় এসে ওর মন্টুদার কথা মনে পড়লো। প্রচণ্ড আড্ডার লোক। বিয়ে থা করেও ঠিক সংসারী হয় নি। বউদি সংসার চালিয়ে এসেছেন, মন্টুদা টাকা দিয়ে খালাস। স্বপ্নেন্দু ট্রাম থেকে নেমে পড়লো।

মন্টুদার বাবার এ অঞ্চলে বড়লোক বলে খ্যাতি ছিলো। গোটা তিনেক বাড়ি আছে। সেগুলোর ভাড়াটা আদ্যিকালের ভাড়ায় বহাল তবিয়তে রয়েছে। এই নিয়ে কোর্ট কাছারি চলছে। এইটেই মন্টুদার একমাত্র অশান্তির কারণ।

গলির মুখে একগাদা কঙ্কাল ভিড় করেছে। স্বপ্নেন্দু দরজার কড়া নাড়লো। প্রথমে কোনো সাড়াশব্দ নেই। তারপর একটা স্বর শোনা গেলো, ' কে ?'

'আমি স্বপ্নেন্দু। দজা খোলো।'

তবু সময় লাগলো। যে খুললো তার দিকে তাকিয়ে স্বপ্নেন্দু ঠাহর করতে পারলো না পরিচয়। সে জিজ্ঞাসা করলো, 'মন্টুদা আছে ?'

বসার ঘরে ঢুকে ইজিচেয়ারটার দিকে তাকাতে স্বপ্নেন্দু চমকে উঠলো। মন্টুদার শরীর ছিলো ছ'ফুট লম্বা। গায়ের রঙ টকটকে লাল। শরীরে এক ফোঁটা মেদ নেই। আর পঞ্চাশ বছর বয়সেও মাথা ভরতি চুল দেখে ঈর্ষা হতো ওদের। অনেক বিখ্যাত পরিচালক মন্টুদাকে ফিল্মে নামাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেকথা শুনলেই হো হো করে হাসতো মন্টুদা, 'বায়োস্কোপ? ও স্কোপ আর নাই বা নিলাম। এই বেশ আছি। খাচ্ছি দাচ্ছি বগল বাজাচ্ছি। কি বসিল ?'

সেই মন্টুদা ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। পরনে পাঞ্জাবি আর সিল্কের লুঙ্গি। কেরোটি সাইজটা লম্বাটে। কি বীভৎস সাদা দেখাচ্ছে ওটা। এই সময় মন্টুদা কথা বললো, 'ভেবড়ে গিয়েছিলে মনে হচ্ছে। বসে পড়।'

'মন্টুদা-।' স্বপ্নেন্দু সন্তর্পণে চেয়ারটায় বসলো।

'তুই যদি নাম না বলতিস তাহলে চিনতাম না।'

'কেন ?'

'আমি এখন কাউকে চিনতেই পারছি না। তুই ভাবতে পারিস আমার বউ আর বড় মেয়েকে গুলিয়ে ফেলেছি দুবার। একবার এক সাইজের প্রোডাকসন। বহুৎ ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে।' মন্টুদা সোজা হয়ে বললো।

'তোমার কোনো রিঅ্যাকশন হয় নি ?'

'রিঅ্যাকশন! নিশ্চয়ই! এর চেয়ে আরাম আর কিছুতে কল্পনা করা যায়। চাকরি করতে হবে না। এ জীবনে। বেশ পায়ের ওপর পা তুলে বই পড়বো। পৃথিবীর কত বই। তুই সিরিয়াসলি পড়লেও এক হাজারের এক ভাগও একটা জীবনে পড়ে শষ করতে পারবি না। কিন্তু এখন?

মুখ্যমন্ত্রী বলেছে আমরা অমর। ডাল ভাতের ঝামেলা নেই। পৃথিবীর সব বই শেষ করবো এখন।

আরামদায়ক একটা শব্দ উচ্চারণ করলো মন্টুদা।

'কিন্তু বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই।'

'বয়ে গেলো। এই কলকাতায় বই-এর অভাব ?'

'হঠাৎ বই নিয়ে পড়লে ?'

'কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে যে রে। নিজেকে খুব অশিক্ষিত মনে হয়। এবার শোধ তুলবো। তোর বউদির ঘ্যানর ঘ্যানর করার দিন খতম।

'কেন ?'

'সংসারের কোনো কাজ করো না। বাজার করো না রেশন করো না। এইসব টিকটিকানি আর শুনতে হবে না। তারও জ্বালা জুড়োলো আমিও বেঁচে গেলাম।' মন্টুদা মুখে হাত দিলো. শুধু. সগিারেটের অভাব ফিল করছি।'

সেকি ? এত জিনিস থাকতে সিগারেটের ?'

'অভ্যেস ভাই অভ্যেস। সেই পনের বছর বয়সে শুরু করেছিলাম।'

যাক, তোর খবর কি বল। অনেকদিন বাদে এলি।'

'মাইরি মন্টুদা, তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে কিছুই হয় নি। যেন আগের অবস্থায় আছ। তোমার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নি।'

উপনিষদ পড়েছিস?'

'না।'

'ওই তো জ্ঞান হবে কোত্থেকে ? মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শুনেছিস ?'

'হ্যা।'

'তাও শিক্ষা হলো না। তিনি বলেছেন সব কিছু স্বাভাবিক মনে মেনে নিতে। তাহলে আর কোনো কষ্ট থাকবে না। আরে একটা বিপ্লব করতে কত পরিশ্রম, কত সংগ্রাম কত রক্তক্ষয়। অথচ দ্যাখ, আমাদের কিছুই লাগলো না অথচ বিপ্লব হয়ে গেলো মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন।'

'মুখ্যমন্ত্রী এত বাধ্য হলো কবে থেকে ?'

'কারণ, বিরোধী নেতাদের বাণী এখনও কানে আসে নি ? সমস্ত খবরের কাগজ এখন বন্ধ। আরে জীবনটাকে এবার চুটিয়ে উপভোগ কর। পড়বি গান শুনবি গাইবি। আমরা তো এখন দেবতাদের মতোন। রোগ যন্ত্রণার বালাই নেই।'

মন্টুদার কথা শেষ হওয়া মাত্র একটি বালক দরজায় এসে দাঁড়ালো। তার পরনের হাফপ্যান্ট দড়ি দিয়ে কোনোরকমে কোমরে বাঁধা।

মন্টুদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি সমাচার বৎস?'

'বাবা আমি খেলতে যাব ?'

'আমার অনুমতি কিবা প্রয়োজন ?'

'মা নিষেধ করছে। বলছে মাঠে ঘাস ছাই হয়ে গেছে, ওখানে যেতে হবে না।'

'চমৎকার। মাকে ডেকে দাও।'

ছেলেটি চলে গেলো। মন্টুদা বললেন, 'খোকা কি ল্যাকি বল তো। সারা জীবন খেলে কাটাবে। ওর শৈশব কোনোদিন কাটবে না। আমরা বলতাম মানুষের শৈশব হলো তার জীবনের গোল্ডেন ডেজ। ও চিরকাল সেই গোল্ডেন ডেজে থাকবে। এর চেয়ে সুখবর আর কি আছে।'

এই সময় কেউ দরজার বাইরে দাঁড়ালো। তার শাড়ির একাংশ দেখা যাচ্ছিলো মন্টুদা ডাকলেন, 'হায়, তুমি ওখানে কেন প্রিয়ে! ভেতরে এসো। এখানে স্বপ্নেন্দু বসে আছে। তোমার দেবর। ওকে দেখে এত লজ্জা কেন?'

বউদি যেন আর সঙ্কুচিত হলেন। তার নিচু গলা শোনা গেলো, 'কি বলছো?'

'কি আশ্চর্য! তোমার এ ঘরে ঢুকতে এত লজ্জা কেন ?'

'না, আমি যেতে পারব না।'

মাথা নাড়লো মন্টুদা। তারপর বললো, ' খোকাকে মাঠে পাঠাও। ও খেলুক।'

'ওখানে শুধু ছাই।'

'ছাই মাখুক। মহাদেব ছাই মাখতেন।'

যা ইচ্ছে করো।

'তোমার নটা আগের মতো আছে। আরে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলো। তোমার কত কাজকর্ম কমে গেছে, তা দেখছো না!'

বউদি অন্যরকম গলায় বললেন, 'আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।'

' চেষ্টা করলেও পারবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমরা অমর।' কথাটা বলে হো হো করে হেসে উঠলো মন্টুদা। স্বপ্নেন্দু বুঝলো বউদি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছে দরজার আড়াল থেকে।

হঠাৎ মন্টুদা বললো, 'দাবা খেলবি ?'

'দাবা?'

'চমৎকার সময় কাটানোর খেলা। তুই তো জানিস।'

'এখন ভালো লাগছে না।'

'ও।' মন্টুদা আবার ইজিচেয়ারের শুয়ে পড়লো, 'তুই এখনও শক্ কাটিয়ে উঠতে পারিস নি। চেষ্টা কর। জলের মত হয়ে যা, যখন যেমন পাত্র তখন তেমন আকার।'

স্বপ্নেন্দু উঠলো 'আজ চলি মন্টুদা।'

'চলে আসিস। মন খারাপ হলেই আসিস, আমি ভালো করে দেবো।'

স্বপ্নেন্দু হেসে ফেললো, 'তুমি সত্যি নমস্য ব্যক্তি।'

সন্ধ্যে হয়ে এসেছিলো। রাস্তায় নেমে চমকে উঠলো স্বপ্নেন্দু। মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে একটা নগ্ন কঙ্কাল, চেঁচাচ্ছে, 'বেরিয়ে আয় শালা, এক বাপের বাচ্চা হলে সামনে আয়।' তার ডান হাতে একটা গোলমতোন বস্তু দেখা যাচ্ছে। সেটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আস্ফালন করছে লোকটা। স্বপ্নেন্দু এগিয়ে যাচ্ছিলো পাশ থেকে একজন বলে উঠলো, 'যাবেন না দাদা, ওর হাতে পেটো আছে।'

' পেটো ?'

'পুরোনো ঝগড়া। আজ বদলা নিতে এসেছে।'

স্বপ্নেন্দু হতভম্ব হয়ে গেলো। যাদের মন্টুদার বাড়িতে যাওয়ার সময় এখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলো তারা আশেপাশে আড়াল খুঁজে সেঁধিয়েছে। পুরোনো অভ্যেস এরা প্রাণভয়ে ভীত। কিন্তু যে লোকটা পেটো ছুঁড়তে এসেছে? স্বপ্নেন্দু লোকটার দিকে তাকালো।

সামনে পড়তে যাচ্ছে লোকটা অকথ্য ভাষায় এই যে এতো বড়ো একটা পরিবর্তন হয়ে গেলো কলকাতায়, মানুষ বিপর্যস্ত, আর কোনো প্রতিক্রিয়া কি ওর মধ্যে হয় নি? এখন পুরোনো আক্রোশ টিকে থাকতে পারে ? স্বপ্নেন্দুর মাথায় ঢুকছিলো না। এ বোধ হয় শুধু কলকাতাতেই সম্ভব হতে পারে।

স্বপ্নেন্দু এগিয়ে গেলো। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এখন কলকাতাবাসী অমর। তিনি মিথ্যে কথা বললেন না। তাই ওই লোকটা যতই শাসাক তার কিছু করতে পারবে না।

গলির ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে আসছে দেখে লোকটা চিৎকার থামিয়ে মুখ ঘোরালো।ওর হাত ক্রমশ পরে উঠে যাচ্ছে। স্বপ্নেন্দু চেঁচালো, 'আমি স্বপ্নেন্দু, তুমি যাকে খুঁজছো সে নই। হাত নামাও।'

'বুঝবো কি করে? সব শালাকে যে একরকম দেখতে হয়ে গেছে।'

ততক্ষণে লোকটার কাছাকাছি পৌছে গেছে সে। না, লোক নয়। হাড়ের গঠন এবং শারীরিক চাঞ্চল্য প্রমাণ করছে এ তরুণ। স্বপ্নেন্দু বললো, 'তুমি খামোখা মাথা গরম করছো তার গলার স্বর কি আমার মতোন?'

একটু যেন চিন্তা করলো ছেলেটা, তারপর বললো, 'এক মনে হচ্ছে না।'

'তাহলে হাত নামাও। তুমি একটা বুদ্ধু, এখন পেটো ছুঁড়ে কাউকে মারলেও তার কিছু হবে না। রক্ত মাংস নেই তো পেটো কি করবে?'

ছেলেটা বললো, 'জানি।'

'জানো মানে ?'

গলার স্বর নামিয়ে আনলো ছেলেটি, ফালতু ভয় দেখাচ্ছি। দেখুন না, শালারা কেমন ছাগলের মতো লুকিয়েছে। দেখে যে কি আরাম লাগছে, কি বলবো।'

স্বপ্নেন্দু আর দাঁড়ালো না। ট্রাম রাস্তায় এসে সে হতভম্ব হয়ে গেলো। না, কোনো গাড়ি ঘোড়ার চিহ্ন নেই সন্ধে হয়ে গেছে। রাস্তার আলোগুলো এদিকে জ্বলছে না। কেমন যেন গা ছমছমে ভাব। তাকে যেতে হবে অনেক দূর। আগে হলে কেয়ার করতো না। কিন্তু এখন এতটা পথ হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। এমনিতে তার পায়ের হাড় কনকন কছে। সন্ধে হচ্ছে বলে লোকজন রাস্তা থেকে কমে যাচ্ছে। স্বপ্নেন্দু ভেবে পাচ্ছিলো না সে কি করবে। একটু একটু করে হেঁটে সে ওয়েলিংটিনের মোড়ে চলে এলো। জায়গাটা

শ্মশানের মতো ফাঁকা। কলকাতা শহরে দাঁড়িয়ে এমন অসহায় সে আর কখনোও হয় নি। এই সময় একটা শিষ শুনতে পেলো সে। কেউ যেন মনের আনন্দে শিস দিয়ে যাচ্ছে। মেরে জুতা হ্যায় জাপানি। চারপাশে চোখ বোলাতে সে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে ভিখিরীটাকে দেখতে পেলো। দুটো ছেঁড়া চট গায়ে চাপিয়ে রাজার মতো হেলান দিয়ে বসে বসে শিষ্ দিচ্ছে। তার উর্ধ্বাঙ্গে কোনো বস্ত্র নেই। হঠাৎ তাকালে আনন্দমঠের মন্বন্তর গ্রামের ছবিটি মনে পড়ে যায়। চোখেচোখি হতে লোকটা খুকখুক করে হাসলো, 'এই যে বাবু, দুটো পয়সা হবে।'

স্বপ্নেন্দু অবাক হলো। ভিখিরীটা এখনও পয়সা চাইছে! কিন্তু হাসলো কেন ? সে কোনো কথা বলার আগেই ভিখিরীটা চেঁচিয়ে উঠলো, 'লাথি মারি টাকার মুখে ! আর আমাকে কারো কাছে পয়সা চাইতে হবে না। কি আনন্দ! আর শালা মানুষের গালাগালি শুনবো না। মেরা জুতা হ্যায় জাপানি। এই যে দাদা, পয়সা হবে।' নিজের গলাটাকেই বিকৃত করে শোনালো লোকটা।

ঠিক তখন একটা প্রাইভেট গাড়িকে আসতে দেখলো স্বপ্নেন্দু। ফিয়াট গাড়িটা যাচ্ছে তার গন্তব্যস্থলে দিকে। স্বপ্নন্দে হাত তুললো। সেটা পর্যাপ্ত নয় ভেবে রাস্তার মাঝখানে নেমে গিয়ে ইশারা করতে লাগলো থামবার গাড়িটা। ড্রাইভার যেন খানিকটা ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে থামালো গাড়িটা। স্বপ্নেন্দু ছুটে গেলো জানলায়।

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি ?'

'শ্যামবাজার।'

'আমিও যাবো। কোনো কিছু পাচ্ছি না। যদি-।'

'উঠে বসুন।'

গাড়িতে উঠে স্বপ্নেন্দু বললো, 'ধন্যবাদ।'

'কোনো দরকার নেই। আগে আমি কাউকে লিফ্ট দিতাম না। এখন তো কোনো ভয় নেই যে হৃৎপিণ্ড দেখছেন ওটা এমন একটা প্রটেকশনে আছে আণবিক বোমা মারলেও ভাঙবে না। ডু য়ু নো, এটা কি ?'

'না।'

'আমাদের পাপ। সারাজীবন আমি যে পাপ করেছি এটা দিয়ে তৈরি।'

হেসে ফেললো স্বপ্নেন্দু, 'তাহলে একটি বছরে শিশু বেলায় কি বলবেন ?'

'সে তার বাপ মায়ের কাছ থেকে রক্তের সূত্রে ওটা পেয়েছে।'

স্বপ্নেন্দু দেখলো গাড়ির কাঁচে রেডক্রশ চিহ্ন রয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি ডাক্তার ?'

'আই ওয়াজ। আমার একটা মরণাপন্ন পেশেন্ট ছিলো নার্সিংহোমে। আজ গিয়ে দেখি সে নাকি হেঁটে বাড়ি চলে গেছে। নার্সিংহোমের সবাই বেকার। সুতরাং আমিও। আমি এখন কি করবো ? মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমাদের মৃত্যু নেই। শরীর নেই যখন অসুখ বিসুখ করবে না কারো। আমি বেকার হয়ে গেলাম। মুখ্যমন্ত্রী বলরেন যারা খাদ্য ব্যবসায় আছে তাদের দেখবেন। বাট হোয়াট অ্যাবাউট আস? তাছাড়া কেমন যেন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিলো। সারাদিন ব্যাপী দেখে বেড়াচ্ছি, চেম্বারে পেশেন্ট গিজগিজ করছে সবসময় টেনশন। সারা জীবনের তো কম আর্ন করিনি। সেগুলো নিয়ে আমি কি করবো এখন ?' ডাক্তার স্বপ্নেন্দুর দিকে তাকালেন, 'আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিভ। জানেন, আমার কাছে কিছু সায়েনায়েড ছিলো। এক ফোঁটা জিভে লাগলে চোখ বন্ধ হয়ে যাবে। মুঠোয় করে মুখে ঢাললাম, হৃদপিণ্ডে মাখালাম। নো রেসপন্স। হাতুড়ি দিয়ে ভাঙবার চেষ্টা করলেন বুকের বাক্সটা। একটুও টসকাল না।'

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললেন ডাক্তার।

স্বপ্নেন্দু নিচু গলায় বললো, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এই পরিবর্তিত অবস্থাকে সহজ মনে মেনে নিতে। অ্যাকচুয়ালি, আপনি আপনার সঞ্চিত টাকা এখন মানুষের উপকারে খরচ

করতে পারেন। খাওয়া-পরা অথবা অসুখ বিসুখ ছাড়াও তো মানুষের অনেক প্রয়োজন আছে। যেগুলো এতকাল আমরা পারতাম না-।'

বাধা দিলেন ডাক্তার, 'আপনি কম্যুনিস্ট?'

'না। মোটেই না।'

'তাহলে রাবিশ কথাবার্তা বলবেন না। আমি সারাজীবন এত কষ্ট করে যা উপার্জন করেছি তা পাঁচজনের জন্যে বিলিয়ে দেবো ? তার চেয়ে নিজের হাতে পুড়িয়ে ফেললে বেশি আরাম লাগবে।'

স্বপ্নেন্দু কথা বললো না। গাড়ি ততক্ষণে কলেজ স্ট্রীট ছাড়িয়ে গেছে। পথঘাট নির্জন এবার ডাক্তারের গলায় হাহাকার শোনা গেলো, 'আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দটাকে চিরকালের জন্য হারালাম।'

'কি সেটা।'

ডাক্তারের করোটিটা দুললো, ইঞ্জেকশন। যখন আমি কারো শরীরের কাছে সিরিঞ্জ নিয়ে যেতাম অদ্ভুত শিহরণ হতো। তারপর যখন সুঁচটা তার গায়ে ঢুকিয়ে দিতাম তখন অদ্ভুত প্লেজার হতো। দিনে অন্তত গোটা পাঁচেক ইঞ্জেকশন না দিলে আমার রাত্রে ঘুম আসতো না।'

' সেকি ?'

'আমি অ্যাদ্দিন কাউকে বলি নি। এখন অবশ্য বাধা নেই। কাউকে বলি নি ঠিক নয় আমার এক মনস্তাত্ত্বিক বন্ধুকে বলেছিলাম। সে জিজ্ঞাসা করেছিলো, আমি কি ইম্‌পোটেন্ট? স্বীকার করি নি তখন। এখন কলকাতার মানুষ আর সেসবের কথা ভাববে না। তাই বলছি, হি ওয়াজ রাইট।'

স্বপ্নেন্দু নড়ে চড়ে বসলো। লোকটা পাগল নাকি ? দু' মিনিটের আলাপে যে সব কথা বলছে তা কোনো সুস্থ মানুষ বলে না ? হয় পাগল, নয় স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়লো, এসব পরিবর্তিত পরিস্থিতির ফল। এখন মানুষের কিছুই হারাবার ভয়ডর নেই। অতএব নিজের গোপন তথ্য খুলে বললেও ক্ষতি নেই।

'শ্যামবাজার কোথায় ?'

স্বপ্নেন্দু রাস্তাটার নাম বললো। ডাক্তার বললেন, 'অয়েল ইন্ডিকেটারের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওটা শূন্যে আটকে আটকে আছে। অথচ গাড়িটা সুন্দর চলছে। জল নেই এক ফোঁটা তবু ইঞ্জিন বন্ধ হচ্ছে না। আগে শুনলে পাগল বলতাম। তাই না ?'

'সেকি, পেট্রোল নেই তবু গাড়ি চলছে?'

'দেখছেন তো।'

'হয়তো আপনার ইন্ডিকেটারটা ঠিক কাজ করছে না।'

'নো। ওটা ঠিক আছে।'

'তাহলো ?'

'এটাও বোধহয় পরিবর্তিত পরিস্থিতির রেজাল্ট। আরে মশাই, গাড়িতে যে এক ফোঁটা জল নেই সেটা বিশ্বাস করেন তো। ওই দেখুন হেদোর কি অবস্থা!'

স্বপ্নেন্দু হতভম্ব হয়ে গেলো। এখন থেকে গাড়ির জন্য আর পেট্রোলের দরকার হবে না? কি আশ্চর্য! স্বপ্নেন্দু মোড়ে এসে গাড়িটা থামালেন। ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে যাচ্ছিলো সে। ডাক্তার বললেন, 'শুনুন মশাই, আপনার নাম জানি না। কোনোদিন দেখা হবে কিনা তারও ঠিক নেই। তবে আমাকে পাগল ভাবার কোনো কারণ নেই। যে যে কারণে আগে পাগল ভাবা হতো, এখন সেইসব কারণগুলো বাতিল হয়ে গিয়েছে। বরং আপনার যদি কোনো পাপ টাপ থাকে তাহলে বলাবলি করতে শুরু করুন, দেখবেন বেশ হালকা লাগবে।'

গাড়িটা চোখের সামনে থেকে গেলেও স্বপ্নেন্দু দাঁড়িয়েছিলো। অদ্ভুত লোক তো! তার পরেই খেয়াল হলো, তার নিজের কোনো পাপ আছে কিনা। স্বপ্নেন্দু অনেক চিন্তা না

করেও তেমন কোনো পাপের কথা মনে করতে পারলো না। ছেলেবেলায় একবার একটা বেড়ালকে ঢিল ছুঁড়ে খোঁড়া করে দিয়েছিলো। খুব চুরি করত বেড়ালটা। সে এমন পাপ, আদৌ পাপ কিনা বলা মুস্কিল, কিন্তু ও কথা কাউকে বলা যাবে না।

ঘরে ঢুকে বিছানায় চিৎপাত হতে গিয়েই স্বপ্নেন্দুর মনে পড়লো। টেবিলের দিকে তাকাতেই কাঁচের আড়ালে সেই লাল গোলাপটাকে খেতে পেলো সে। গোলাপটাকে আরও টাটকা আরও বেশি লাল দেখাচ্ছে। সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্বপ্নেন্দুর মন শান্ত হয়ে গেলো।

পরের দিন রেডিও খুলে স্বপ্নেন্দু বুঝলো কলকাতার অবস্থা বেশ স্বাভাবিক। চমৎকার গানবাজনা হচ্ছে। খবরেও বলা হলো প্রচুর ট্রাম বাস চলছে সকাল থেকে। গত দুদিনে কলকাতায় খুনজখম দূরে কথা সামান্য ছিনতাই-এর ঘটনা পর্যন্ত ঘটে নি। তবে ধুতি এবং লুঙ্গির চাহিদা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। নাগরিকদের কাছে আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, অবলম্বে যে যার কাজে যোগ দিন। আজ স্বপ্নেন্দু চাদরটাকে বাতিল করলো। কারণ ওতে মনের জড়তা ধরা পড়ে। যা হয়েছে তা ওর একার ক্ষেত্রে নয় যখন, তখন প্রকাশ্যে মেনে নেওয়াই ভালো। ঘর থেকে বের হবার আগে সে আবার ফুলটার দিকের তাকালো। চমৎকার তাজা। করকাতা শহরে একমাত্র তার কাছেই ফুল আছে, খাঁটি ফুল। ওটাকে ছোঁওয়া যাবে না, টেবিল থেকে নড়ানো যাবে না। অথচ এই ঘরে ফুলটা একা পড়ে থাকবে সেটাও ভালো লাগছিলো না। স্বপ্নেন্দু একটা চাদর দিয়ে বড় জারটাকে ঢেকে দিলো।

আজ ট্রামে বাসে খুব ভিড়। ট্রামে বাসে যত লোক ধরত এখন তার ডবল ধরবে।'

কথাটা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। একজন বললো, 'মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন। বিপ্লব এলেও ট্রান্সপোর্ট প্রব্লেম সলভ করতে পারতো না।'

প্রথম জন স্বপ্নেন্দু দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের বাথরুমটাকে কি করবেন ভাবছে?'

'বাথরুম ?' স্বপ্নেন্দু হতভম্ব।

'দূর মশাই। এখন তো আর বাথরুমের প্রয়োজন নেই। খামোকা কিছু ঘর খালি পড়ে থাকবে বাড়িতে বাড়িতে। আমি ভাবছি ওটা ভাড়া দিয়ে দেবো। আমদের বাথরুমটা বেশ বড়।'

দ্বিতীয়জন বললো, 'ভাড়ার টাকা নিয়ে কি করবেন দাদু ?'

'কেন ? শখের জিনিস কিনবো। এই ধরো কালার টিভি।'

'টিভি? টিভি স্টেশন তো চালু হয় নি।'

'হয় নি, কিন্তু হবে।'

'ওঃ টিভির মেয়েগুলোকে কি রকম দেখাবে ভাবুন তো! আমার বড় মেয়েটা দেখতে ভালো নয় বল অ্যানাউন্সারের চাকরি পায় নি। এখন আবার অ্যাপ্লাই করতে বলি, কি বলেন?'

স্বপ্নেন্দু, কলকাতার মানুষ বেশ সহজেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। হয়তো মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ কাজ হয়েছে। তার বেশ ভালো লাগছিলো। লিফটের সামনে বিরাট লাইন। কিন্তু আজ অনেক বেশি লোক আসছে বলে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে লাইনটা। স্বপ্নেন্দু দেখলো লাইনে তিনটে শাড়ি আছে। তার মানে মেয়েরাও অফিসে এসেছে। তার হৃৎপিণ্ড কাঁপতে লাগলো হেনা সেন আছে নাকি লাইনে ?' কি করে হেনাকে চিনবে সে ? আজ সকালে রেডিওতে বলেছিলো, প্রত্যেক নাগরিক আইডেন্টিটি কার্ড সঙ্গে নিয়ে অফিসে যাবেন। কিন্তু সে কার্ড তো ব্যাগের ভেতরে থাকবে।

স্বপ্নেন্দু ছটফট করছিলো। লিফটে উঠে সে শাড়ির দিকে তাকালো। সেদিন হেনা সেন যে শাড়ি পরেছিলো সেটার সঙ্গে তিনটির রঙ মিলছে না। হেনা যদি তাকে দ্যাখে

তাহলে নিশ্চয়ই হাসবে। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হলো, তার চেহারাও তো হেনার চেনার কথা নয়।

নিজের ফ্লোরে এসে স্বপ্নেন্দু অবাক হলো। দেয়ালে পোস্টার পড়েছে, কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছারিতা চলবে না, চলবে না। ঘুষখোর অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। নিজের ঘরে যাওয়ার সময় সে দেখলো অফিসে জটলা হচ্ছে। বেশ উত্তেজনা। ঘরে ঢুকে সে দেখলো তার চেয়ারে কেউ বসে আছে। তাকে দেখে লোকটা উঠে দাঁড়াতে স্বপ্নেন্দু চিনতে পারলো। লোকটা নির্জীব গলায় জিজ্ঞাসা করলো,

'আপনি কি সাহেব?'

'এক গ্লাস জল দাও হরিমাধব।' বলতে বলতে খেয়াল হলো আর জলের দরকার নেই, জল পাওয়াও যাবে না। হরিমাধব ততক্ষণে তিন হাত দূরে ছিটকে গেছে, 'মাপ করুন স্যার। আমি ভাবি নি আপনি আসবেন।'

'ভাবোনি?'

'না স্যার। বিশ্বাস করুন এর আগে আমি কখনও ওই চেয়ারে বসি নি। আজ বড় ইচ্ছে হলো শরীরটা যখন পাল্টে গেলো, নিজেকে ভুতের মতো দেখাচ্ছে যখন তখন ভাবলাম চেয়ারটায় বসে দেখি কেমন লাগে।'

ঠিক আছে।' স্বপ্নেন্দু চেয়ারটায় বসলো। অনেক কষ্টে প্যান্টটাকে কোমরে শক্ত করে বেঁধেছে। কিন্তু কেবলই মনে হয় এই বুঝি পড়ে গেলো।

হরিমাধব এগিয়ে এলো, 'স্যার, অফিসের সবাই খুব ক্ষেপে গেছে।'

' কেনো?'

'ওই ট্রান্সফার হবে শুনে। আজ কেউ কাজ করবে না বলেছে।' এখনও ওইসব ওদের মাথায় আছে নাকি?'

'হ্যাঁ স্যার। আপনি সাবধানে থাকবেন।' হরিমাধব দরজার দিকে তাকালো, 'আর হ্যাঁ, ম্যাডাম আপনাকে ফোন করেছিলেন দুবার।' সঙ্গে সঙ্গে মিসেস বক্সীর শরীরটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। মরলেও বোধহয় স্বভাব পাল্টাবে না। তার পরই ওর হাসি পেলো। আর এখন তো হাসি পেতেই তা খুক খুক করে বেরিয়ে পড়ে। কঙ্কালশরীর বোধহয় নিঃশব্দে হাসতে পারে না। স্বপ্নেন্দু টেলিফোনটার দিকে তাকালো।

অপারেটর এসেছে তাহলে।

সে আবার হরিমাধবকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার কেমন লাগছে হরিমাধব?'

'ভালো না স্যার। এই ভুতের চেহারা নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালেই শিউরে উঠি। আমার পরিবারকে আবার ঠিক শাঁকচুন্নির মতো দেখায়। নরক, নরকে এসে গেছি। স্যার, শাস্ত্রে লেখা ছিলো কলিযুগের পর নাকি এইরকম সাক্ষাৎ নরকবাস ঘটবে। ফুঁপিয়ে উঠলো হরিমাধব। স্বপ্নেন্দু তাকালো হরিমাধবের বুকের দিকে। অদৃশ্য গোলকের গর্তে থাকা হৃৎপিণ্ডটা থরথরিয়ে কাঁপছে। তার মানে লোকটার কান্না জেনুইন। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেলো স্বপ্নেন্দুর। এখন কেউ ভান করলে তার বুকের দিকে তাকালেই ধরা পড়ে যাবে। বাঃ ফার্স্ট ক্লাশ।

এই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠলো। হ্যালো, বলতেই মিসেস বক্সীর গলা ভেসে এলো, কখন এসেছেন? কেউ বলেনি আমি ডেকেছি?'

'বলেছে।' স্বপ্নেন্দু নিস্পৃহ স্বরে বললো।

'বলেছে? তবু আপনি আমার সঙ্গে দেখা করছেন না?' যাচ্ছি। আমি একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম।' রিসিভার নামিয়ে রেখে স্বপ্নেন্দু হরি মাধবকে জিজ্ঞাসা করলো, আজ অফিসে সবাই এসেছে?' হরিমাধবের করোটিটা নড়লো, 'না স্যার, অনেকেই আসেনি। পেটের ধান্ধা যখন আর করতে হবে না তখন মিছিমিছি কেনো আসতে যাবে?'

স্বপ্নেন্দুর মনটা খারাপ হয়ে গেলো। সবাই আসেনি? তার মানে হেনা সেনও না আসতে পারে। প্রশ্নটা করতে গিয়েও পারলো না, কেমন সংকোচ বোধ হলো। হরিমাধব

আবার এই নিয়ে গপ্পো করবে যা করতে হবে তাতে অফিসিয়াল ব্যাপার যোগ না করলে হরিমাধবরা অন্যভাবে দ্যাখে।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসামাত্র করিডোরে চিৎকার শুনতে পেলো সে। দশবারো জন কঙ্কাল বিভিন্ন পোশাকে দাঁড়িয়ে হাত তুলে শ্লোগান দিচ্ছে। সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দেবার হুমকি দিচ্ছে ওরা। স্বপ্নেন্দুকে দেখেও দেখলো না যেন। বোধহয় চিনতে পারে নি। স্বপ্নেন্দু সুড়ুৎ করে মিসেস বক্সীর দরজার কাছে চলে এলো। সেখানে একটা কঙ্কাল উর্দি পরে দাঁড়িয়ে আছে।

'কাকে চাই?' লোকটা জিজ্ঞাসা করলো।

এই প্রথম মিসেস বক্সীর ঘরে ঢুকতে বাধা পেলো স্বপ্নেন্দু। বিরক্ত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কে ?'

'আমি ওর বেয়ারা। ম্যাডাম কাউকে ঘরে ঢুকতে দেবেন না।' 'কি আশ্চর্য! তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি স্বপ্নেন্দু!' সঙ্গে সঙ্গে লোকটা কপালে হাত ঠেকালো 'ক্ষমা করবেন স্যার। আমার একবার সেরকম মনে হয়েছিলো কিন্তু সব মুখগুলো দেখতে যে একরকম। যান স্যার, ম্যাডাম আপনাকে যেতে বলেছেন।' এরকম পাহারা তো আগে দাওনি।'

'ওই যে, অফিসের লোকরা চেঁচাচ্ছে তাই ম্যাডাম বললেন।' স্বপ্নেন্দু দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। বিশাল ঘরে কেউ নেই। টেবিলের ওপাশে ঘুরন্ত চেয়ারটাও ফাঁকা। স্বপ্নেন্দু একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। ঘরের কোণায়, একা পর্দা ঘেরা জায়গা আছে। সেখানে ইজিচেয়ারে শুয়ে মিসেস বক্সী বিশ্রাম করেন। কিন্তু লাগোয়া বাথরুমের দরজাটা খোলা। ঘরে যিনি ঢুকলেন তাকে দেখে চমকে উঠলো স্বপ্নেন্দু। অসম্ভব বেঁটে এবং রোগা একটা কঙ্কালর গায়ে আলখাল্লা টাইপের ম্যাক্সি জড়ানো। করোটির ওপরে একটা বড় রুমাল বাঁধা। ঘরে ঢুকেই ম্যাডাম স্থির হলেন, কে?"

'আমি ম্যাডাম, স্বপ্নেন্দু।'

'আই সি।' গুড়গুড় করে উনি চলে এলেন নিজের চেয়ারে। তারপর শরীরটা সিধে রেখে বললেন, 'আমি ভাবছি প্রত্যেকের বুকের ওপরে একটা নেমপ্লেট রাখতে বলবো। নইলে চিনতে অসুবিধে হচ্ছে।

এত দেরি হলো কেন ?'

'অফিসে আসবো না ভেবেছিলাম।' সে কি? কেন ? এখন তো শরীর খারাপের অজুহাত টিকবে না।'

'না। চাকরি করবো না ভাবছি।'

'হোয়াট ডু য়ু মিন? আপনি শোনেননি চিফমিনিস্টার কি বলছেন? প্রত্যেক নাগরিক এতকাল যা যা করেছেন এখনও তাই করতে হবে। অন্তত সরকারি বেসরকারি চাকরিতে যারা ছিলেন তাদের নিষ্ঠার সঙ্গে সেই চাকরি করতে হবে। একটা স্পেশ্যাল পুলিশ ফোর্স এই ব্যাপারটা দেখবে।' খুক খুক করে হাসলেন মিসেস বক্সী, 'চাকরি করবো না বললেই মিটে গেলো ?'

'সে কি? পুলিশরাও এখনও অ্যাকটিভ আছে নাকি?' মোর অ্যাকটিভ। আপনি ভাবছেন গুলি করেও যখন কিছু হবে না তখন যা ইচ্ছে করবেন?' এর মধ্যে বিজ্ঞানীরা এমন একটা অস্ত্র বের করেছেন যার রিঅ্যাকশনে হৃৎপিণ্ড আধঘন্টা অসাড় হয়ে যাবে। সেই সময় আপনি নড়তে চড়তেও পারবেন না। আপনাকে অ্যারেস্ট করে টিউব রেলে ফেলে রাখা হবে।'

'টিউব রেলে?'

'ইয়েস টিউব রেলেতো ইনকমপ্লিট। তাছাড়া এখন আর টিউবের কোনো প্রয়োজনও হবে না। ট্রান্সপোর্ট প্রবলেম সলভ্ড। তাই টিউবটাকে অন্ধকূপ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। পানিশমেন্ট সেল।' তারপরে অন্য স্বরে মিসেস বক্সী বললেন, 'ওসব চিন্তা ছাড়ুন।

ইউ আর ইয়ং হ্যান্ডসাম। কত ব্রাইট প্রসপেক্ট সামনে পড়ে আছে। আজকের অ্যাটেন্ডেন্স অবশ্য সেভেন্টি পার্সেন্ট। নট ব্যাড।'

স্বপ্নেন্দু ঠিক ঠাওর করতে পারছিলো না মিসেস বক্সী ভয় দেখাচ্ছেন কিনা। তবু সে জিজ্ঞাসা করলো, 'ডেকেছিলেন কেনো?'

মিসেস বক্সী বললেন, 'শ্লোগান শুনেছেন? মানুষের অভ্যেস কোথায় যাবে? এই চেঞ্জড শরীরেও ওরা চেঁচাচ্ছে। এটা বন্ধ করতে হবে।'

'বলুন কি করবো?'

'আর, সেটা আপনি ঠিক করুন।'

'ওই ট্রান্সফার অর্ডারটা বাতিল করে দিন।'

'সে কি?'

'ঠিকই বলছি। এখন আর পার্টিরা ঘুষ দিতে আসবে না। কারণ মানুষের অনেক প্রয়োজন আর ঠিক আগের মতো নেই। তাছাড়া ঘুষ নিয়ে ওরা কি করবে? টাকারও মূল্য কমে গেছে!'

ইউ আর ব্রাইট। আমি অনেকবার ভেবেছি। সত্যি কথা। এখন আর ঘুষ দেবে কে? আর ঘুষ নিয়ে কিই বা করবে। কিন্তু এটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। চট করে আমরা এই সিদ্ধান্ত ওদের জানাবো না।' মিসেস বক্সী চেয়ার ছাড়লেন। মহিলার চেহারা এখন আমূল পাল্টে গেছে। সেই থপথপে মাংসের তালটা চলে যাওয়ায় বেশ ছিমছাম দেখাচ্ছে। কিন্তু ম্যাক্সিটা নিশ্চয়ই ওঁর নয়। মিসেস বক্সী হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আমাকে খুব কুৎসিত দেখাচ্ছে?'

'না না। বিউটিফুল।'

'ওঃ বাটারিং করবেন না। ওটা আমি একদম পছন্দ করি না। আমিতো প্রথমে এমন শকড ছিলাম যে বিছানা থেকে উঠতেই পারি নি। নাউ আই ফিল ইটস বেটার। অ্যাট লিস্ট উই আর সেফড্ ফ্রম ইওর হাঙ্গরি আইন।' তার পরেই হেসে ফেললেন মিসেস বক্সী, রাগ করবেন না। আমি আপনাকে মিন করি নি। ইউ আর গুড। আসুন না আজকে সন্ধ্যেবেলায় আমার বাড়িতে। আমার মেয়ে খুশি হবে

'আপনার মেয়ে? স্বপ্নেন্দু এতটা তরল হতে ম্যাডামকে কখনও দ্যাখে নি।

'হ্যাঁ। এবার লরেটো থেকে পাশ করছে। ম্যাথ্রিটা তো ওরই।'

'ও ঠিক আছে যাওয়া যাবে।' স্বপ্নেন্দু উঠে দাঁড়ালো।

'কিন্তু বিনা শর্তে নয়।'

'মানে?'

'ওদের ক্ষমা চাইতে হবে বিক্ষোভ করার জন্যে। তারপর আমরা ট্রান্সফার অর্ডারটা ক্যানসেল করবো। ও কে?'

যাঃ বাবা। কোন্ কথা থেকে কোথায় চলে এলেন মহিলা। স্বপ্নেন্দু করোটি নেড়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

দুপুরে খবর পাওয়া গেলো ওদের গেট মিটিং-এ একদম লোক হয় নি।

নেতারা অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও কর্মচারিরা নাকি সেখানে উপস্থিত হয় নি। তারা বলছে এখন হেহেতু অফিসে আসা বাধ্যতামূলক তাই আসতে হয়। ট্রান্সফার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনা লাভ নেই।

নেতারা নাকি খুব ভেঙে পড়েছে কর্মচারীদের এই ব্যবহারে। টিফিনের পর নেতারা এলো তার ঘরে। স্বপ্নেন্দু ওদের বসতে বললো,

'বলুন, কি চাই আপনাদের।'

'ওটা, করবেন না।'

কর্মচারিরা তাই চইছেন?'

'এখন তো অনেকেই সরে যাচ্ছে। কিন্তু এটা আমাদের প্রেস্টিজের প্রশ্ন।'

'মিসেস বক্সীর সঙ্গে কথা বলুন।'

'না। উনি খুব একরোখা। তাছাড়া আমরা আপনাকে মধ্যস্থতা করতে বলছি।'

'মেনে নিন। অফিস অর্ডার বলে কথা।'

'মেনে নিলে আমাদের আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে।'

'আপনারা আর কি নিয়ে আন্দোলন করবেন?'

'চাকরি যখন করছি তখন সমস্যা তো আসবেই। তাছাড়া এখন থেকে আর আটান্ন বছর বয়সে রিটায়ারমেন্ট নেই। অতএব সমস্যা থাকবেই।'

'রিটায়ারমেন্ট নেই?'

'না স্যার। কারণ মানুষ মরছে না। নিউ জেনারেশন আসছে না।'

স্বপ্নেন্দু চমকে উঠলো, 'তাহলে তো প্রমোশনও হবে না।'

'না স্যার।'

এক মিনিট ভাবলো স্বপ্নেন্দু। এই চাকরি চিরকাল করে যেতে হবে?

কোনো প্রমোশন নেই? তারপর লোকগুলোর মুখের দিকে তাকালো সে। করোটি দেখে মনের প্রতিক্রিয়া বোঝা যায় না। আর এরা শার্ট পরে আছে বলে মনের প্রতিক্রিয়া ওদের হৃৎপিণ্ড দেখা যাচ্ছে না। হরিমাধবের শার্টের বোতাম একটাও নেই। তাই ওরটা বুঝতে অনেক সুবিধে।'

হঠাৎ হেনা সেনের কথা মনে পড়লো। সে জিজ্ঞাসা করলো, 'শুক্রবার যে মহিলা তর্ক করছিলেন। তিনি কোথায়? তিনি কি এখন আপনাদের সঙ্গে আছেন?'

নেতারা মুখ চাওয়াচায়ি করলো। শেষ পর্যন্ত একজন বললো, 'উনি আসেন নি আজ।'

ও।' স্বপ্নেন্দুর মন খারাপ হয়ে গেলেও সে মুখে বললো, 'ভদ্রমহিলা বিচক্ষণ কথাবার্তা বলেছিলেন। অলরাইট। আপনারা যান, আমি দেখছি কি করা যায় বুঝতেই পারছেন এসব আমার হাতে নেই।'

'আমরা জানি স্যার। আপনি মধ্যস্থতা করুন। ততক্ষণ আমরা একটু আধটু আন্দোলন চালাবো।'

'আন্দোলন চালাবেন মানে?'

'না চালালে ইমেজ নষ্ট হয়ে যাবে।'

নেতারা চলে গেলে স্বপ্নেন্দু উঠে দাঁড়ালো যাক প্রব্লেম সলভড। তবে এ কথা এখনই মিসেস বক্সীকে বলা চলবে না। ওঁকেও দুদিন ঝুলিয়ে রাখলে অন্য কাজ নিয়ে টিকটিক করবেন না। শালা, প্রমোশনই যখন কোনোকালে হবে না তখন কাজ দেখিয়ে লাভ কি? টেলিফোনটা শব্দ করতেই বিরক্ত হলো স্বপ্নেন্দু। মিসেস বক্সী নির্ঘাৎ দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আবার ফিরে এলো সে। সে যে বেরিয়ে যাচ্ছে একথা বলে দেয়া ভালো।

'আমি মুখার্জি বলছি।'

যাঃ শালা। থার্ড অ্যাসেসমেন্ট অফিসার মুখার্জির ফাইলটা তো মিসেস বক্সীর কাছে আটকে আছে। সে জবাব দিলো, 'বলুন।'

'শোনো। তোমাকে শুক্রবার যে রিকোয়েস্ট করেছিলাম সেটা করতে হবে না। ম্যাডামের অ্যাপ্রুভালের কোনো দরকার নেই।'

'কেনো?'

'দিগম্বর হয়ে বসে আছি এখন। আমি আর ইন্টারেস্টেড নই।'

টেলিফোন নামিয়ে হেসে ফেললো স্বপ্নেন্দু। বিপ্লবও এতটা কার্যকরী হতো না। মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন। জাঁদরেল ঘুষখোর অফিসার আর ঘুষের জন্যে অনুরোধ করছে না চমৎকার।

মিসেস বক্সীকে জানালো না স্বপ্নেন্দু। হরিমাধবকে বলে গেলো কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতে শরীর খারাপ বলে তাড়াতাড়ি চলে গেছেন। হরিমাধবের বিস্ময় বাড়লো, 'স্যার, আপনার শরীর খারাপ?'

তৎক্ষণাৎ খেয়াল হলো। শরীর কোথায় যে খারাপ হবে? এই অজুহাতটা চিরকালের মতো বাতিল হয়ে গেলো। স্বপ্নেন্দু গম্ভীর গলায় বললো,

'ঠিক আছে। কেউ খুঁজলে বলে দিও জরুরি কাজে বেরিয়েছি।'

এখন দুপুর শেষ হয় নি। রোদের তাপ বড্ড বেশি। কিন্তু ঘাম হচ্ছে না বা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকায় তেমন কষ্ট হচ্ছে না। বাস থেকে নেমে স্বপ্নেন্দু হেসে ফেললো। কন্ডাকটার চুপচাপ বসে আছে। কোনো যাত্রীকেই টিকিট কাটতে হচ্ছে না। এটা কদ্দিন চলবে কে জানে।

রাস্তাটা নির্জন। হঠাৎ স্বপ্নেন্দুর বুকের ভেতরটায় থম ধরলো। তার হৃৎপিণ্ড কাঁপতে শুরু করলো। খুব নার্ভাস লাগছে এখন। এইভাবে চট করে চলে না। এলেই ভালো ছিলো। তারপর মরীয়া হলো সে। লাল ব্লাউজ লাল শাড়ির আগুন তাকে চম্বুকের মতো টানছিলো।

কলিংবেলের বোতাম আঙুল রাখতেই ভেতরে যেন ঝড় বয়ে গেলো। নির্জন দুপুরের বোধহয় আওয়াজ বেশি হয়। কেউ দরজা খুলছে না। মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করার পর স্বপ্নেন্দু আবার বেল টিপলো এরপর ধীরে ধীরে দরজা খুলে দাঁড়ালেন এক মহিলা। মহিলা কারণ তাঁর পরনে সাদা শাড়ি, মাথাটা বিরাট ঘোমটার আড়ালে ঢাকা। সেই পরশুরামের গল্পের চরিত্র যেন।

'কি চাই ?'

'হেনা সেন আছেন ?' স্বপ্নেন্দু স্বর কাঁপছিলো।

'আপনি কে?'

'আমি ওঁর অফিসে কাজ করি। আমার নাম স্বপ্নেন্দু।'

'ও তুমি। এসো ভেতরে এসো।' মহিলা দরজা ফাঁক করতে স্বপ্নেন্দু ঢুকে পড়লো। দরজা বন্ধ করে মহিলা কাতর গলায় বললেন, 'একি হলো বাবা আমরা কি এমন পাপ করেছি যে এই শাস্তি পেতে হচ্ছে।'

স্বপ্নেন্দু বুঝলো ইনি হেনার মা। মনে পড়লো না সেদিন ইনি তাকে তুমি বলেছিলেন কিনা। সে বললো, 'কি আর করা যাবে বলুন।' মহিলা বললেন, 'এইভাবে বাঁচতে চাই না বাবা। তিনি স্বর্গে বসে রইলেন আর আমি চিরকাল এই নরকে পড়ে থাকবো। আমার তো বাঁচাবার কোনো আকাঙ্ক্ষাই ছিলো না। শুধু ওই মেয়েটার একটা হেল্লা করতে পারলে! কলকাতার সব মানুষের কি এই দশা?'

'হ্যাঁ মাসীমা।'

'কলকাতার বাইরের ?'

'তাদের কথা জানি না।'

পরশু থেকে আমার বিছানা ছাড়েনি। শুধু পড়ে পড়ে কেঁদে যাচ্ছে। তুমিই প্রথম আমাদের বাড়িতে এলে।'

'ওর সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?' স্বপ্নেন্দু যেন অনুনয় করলো।

'কথা? ও তো কথাই বলতে চাইছে না। কতবার ওকে বললাম সহজ হতে তা মেয়ে আমাকে খেঁকিয়ে উঠছে। সরে যাও সরে যাও আমি কাউকে সহ্য করতে পারছি না। ওকি তোমর সঙ্গে কথা বলতে চাইবে?' মহিলা মাথার পড়ে যাওয়া ঘোমটা চট করে টেনে নিলেন। স্বপ্নেন্দু লক্ষ্য করলো এঁরা করোটির গায়ে সামান্য হলদে দাগ রয়েছে।

'তাহলে থাক। ওকে বলবেন আমি এসেছিলাম।' নিশ্বাস ফেললো স্বপ্নেন্দু। মহিলা বললেন, দাঁড়াও। তুমি বড়ো ভালো ছেলে বাবা।'

অবাক হয়ে স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করলো একথা বলছেন কেনো?'

নিশ্চয়ই কারণ আছে। আমি ভাবছি তুমি যদি নিজে গিয়ে ওকে সহজ হতে বলো তাহলে যদি কাজ হয়। আগে থেকে বললেও আপনি করবে।

'আপনি যদি বলেন।' স্বপ্নেন্দু হৃৎপিণ্ড কাঁপতে লাগলো।

'আগে হলে হয়তো বলতাম না। কিন্তু এখন আমার মাথা ঠিক নেই। দ্যাখো, যদি পারো ওকে সহজ করতে।ওই দরজা দিয়ে যাও।'

স্বপ্নেন্দু নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো। তারপর ধীরে ধীরে সে বাঁ দিকের ছোট্ট প্যাসেজটা ধরে হেঁটে একটা ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়ালো। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো মহিলা নেই। নিজের জামা ঠিক করে নিলো স্বপ্নেন্দু। তারপর দরজায় হাত দিলো।

ঘরটা অন্ধকার। সমস্ত জানলা বন্ধ। প্রথমে দৃষ্টি চলছিলো না। তবু স্বপ্নেন্দু ভেতরে ঢুকতেই খাটটাকে দেখতে পেলো। খাটের ওপর হেনা সেন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। হলদে ফুল তোলা ম্যাক্সি ওর গায়ে। বড়ো হাতায় কবজি পর্যন্ত ঢাকা।পায়ের হাড় এবং সাদা করোটি এবার দেখতে পেলো স্বপ্নেন্দু। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকায় হেনা সেন তার উপস্থিতি টের পায় নি। স্বপ্নেন্দুর হৃৎপিণ্ড স্থির হয়ে গেলো। হেনা সেন ছাড়া নিশ্চয়ই এই ঘরে অন্য কেউ থাকবে না। সে চোখ বন্ধ করতে গিয়েও পারলো না। কারণ তার চোখের পাতাই নেই। হৃৎপিণ্ড অনুভবে দৃষ্টিশক্তি যোগাচ্ছে।

সেই হেনা সেন? স্বপ্নেন্দুর মনে হচ্ছিলো এখানে এলেই ভালো হতো। যে মাখনের মতো নরম শরীর তাকে চুম্বকের মতো টেনেছিলো সেটাকে স্মৃতিতে বাঁচিয়ে রাখাই ছিলো। এখন তো হেনা সেন তারই মতো বীভৎস। অথচ এই ঘরে ঢোকবার আগে বুকের ভেতর ভূমিকম্প হচ্ছিলো তার। তার অনুরণর তো এখনও মেলায় নি। স্বপ্নেন্দু নিচু স্বরে ডাকলো, 'শুনুন।'

হেনা সেনের কোনো প্রতিক্রিয়া হলো কিনা বুঝতে পারলো না সে। এক পা এগিয়ে সে আবার ডাকলো, 'মিস্ সেন!'

এবার চকিতে করোটি ঘুরে গেলো। আর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসে হেনা সেন চিৎকার করে উঠলেন, 'কে? ও মাগো!' তার একটা হাত মুখে চাপা দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ধিক্কার দিলো স্বপ্নেন্দু। একি দেখছে সে। কিন্তু ততক্ষণে সেই চামড়া-মাংস-রক্তহীন কঙ্কালের মুখটা চাদরে ঢেকে ফেলেছে হেনা সেন। এখনও যেন ঘরের মধ্যে আর্তনাদটা পাক খাচ্ছে। স্বপ্নেন্দু ঘোর কাটিয়ে বলে উঠলো, 'নার্ভাস হবেন না মিস সেন। আমি স্বপ্নেন্দু।'

'স্বপ্ন?' সঙ্গে সঙ্গে হেনা সেনের মাথাটা আলোড়িত হলো, 'আমি চিনি না আপনাকে। কেনো এলেন এখানে? বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি।

ওমা, মাগো।'

আর্তনাদ শুনে স্বপ্নেন্দু এতটা অবাক হয়ে গিয়েছিলো যে কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে পারে নি প্রথমটায়। যেন সত্যি কোনো মহিলার ঘরে কে আচম্বিত ঢুকেছে এবং তিনি চিৎকার করছেন আত্মরক্ষার জন্যে স্বপ্নেন্দু নামটা শুনেও ওর কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নি দেখে সে আরও তাজ্জব হলো। এখনই সেই মহিলা ছুটে আসবেন এবং তাকে বেরিয়ে যেতে হবে এই আশংকায় স্বপ্নেন্দু দরজার দিকে তাকালো। কিন্তু মহিলার আসার কোনো লক্ষণ দেখা না যাওয়ায় সাহস বাড়লো তার। হেনা সেন এখন দুহাতে চাদরটাকে আঁকড়ে ধরে কাঁপছেন।

স্বপ্নেন্দু আর এক পা এগোলো, 'মিস সেন। আমি আপনার অফিসের কাজ করি। এই দুদিন আমি চিনতে পারছেন না?'

'না, আমি কাউকে চিনি না।' উত্তেজনা আছে কিন্তু এবার তার ঝাঁঝ কম।

'তা কি হতে পারে? আমি শুক্রবার এখানে এসেছিলাম।'

'আজ কেনো এসেছেন? মজা দেখতে?'

'মোটেই নয়।' স্বপ্নেন্দু আবার দরজাটার দিকে তাকালো মহিলা ওর ওপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছেন কিনা কে জানে! তবু সে মরীয়া হয়ে বললো, 'এই কদিন আমি আপনার কথা ভেবেছি।'

'কি মিথ্যে বলতে এসেছেন!'

মিথ্যে নয়। আমার বলা শোভন নায়।' স্বপ্নেন্দুকে থামিয়ে দিয়ে হেনা সেন বললো, 'কি জন্যে এসেছিলেন আমি জানি। এখন তো আর সেসব নেই। আমার শরীর, আমার শরীরটার দিকে তাকালে পুরুষ জাতটার চোখ লোভে চকচক করে উঠতো। ওই ঘেন্নায় আমি! তা আর এখন কেনো? এখন তো আমি একটা কঙ্কাল। এখন আমাকে একটু নিশ্চিন্তে থাকতে দিন।

'আপনি ভুল বলছেন।'

'একটুও না। সেদিন যখন আপনি আমাকে ধরে ডেকেছিলেন তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। সেই চোখ। লালসা থিক থিক করেছে। আজ আমার কিছু নেই। আপনাদের কাছে আমার কোনো মূল্য নেই। উঃ।'

'আমি আবার বলছি আপনি ভুল বলছেন।'

'নাঃ। চিৎকারটা বাড়লো। তারপর এক টানে চাদর খুলে হিসহিসে গলায় হেনা সেন বললো, 'দেখুন চেয়ে দেখুন। এই হলাম আমি।'

স্বপ্নেন্দু এবার ভালো করে দেখলো তার বুক মুচড়ে যাচ্ছিলো। সেই ঠোঁটের জাদুকরী হাসি, চোখের কাজ, গালের টোল আর মুখের মায়া কোথায় মিলিয়ে গেলো। একটা ছোট্ট কঙ্কালের জেদী মুখ তার দিকে ফেরানো। কিন্তু সেই সঙ্গে তার মনে হলো রাস্তাঘাটে এই কদিনে সে অনেক কঙ্কালের মুখ দেখেছে। তাদের চোয়াে , পাল, নাকের তুলনায় হেনা সেনের মুখ অনেক সুন্দর। অন্তত ওর চিবুক একটা থাকতে মুগ্ধ হলো স্বপ্নেন্দু। তারপর বললো, 'আমার মুখের দিকে দেখুন। আমিও আপনার মতোন। তবে একটা কথা বলি, সব হারিয়েও আপনি অনেকের চেয়ে সুন্দর, বেশি সুন্দর।'

'আবার সেই মিথ্যে কথা! সারাজীবন ধরে এই স্তুতি শুনেছি। আর না। কি আশায় আপনি এসেছেন আমার কাছে? আমার শরীর? তবে দেখুন। হঠাৎ দুহাতে পাগলের মতো ম্যাক্সিটা খুলে ফেললো হেনা সেন, ' দেখুন, ভালো করে দেখুন। আমার শরীরে এখন কটা হাড় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আপনারা, পুরুষজাত চিবিয়ে সব নরম সুন্দর গিলেছেন। বাট নাউ আই অ্যাম ফিনিশড্। গেট আউট প্লিজ।' হেনা সেন থরথর করে কাঁপছিলো।

স্বপ্নেন্দুর মনে হলো অসম্ভব সুন্দর একটা দৃশ্য দেখছে। হেনা সেনের দুটো পা ঈষৎ ভাঁজ করা, কোমর বাঁকানো, বুকের খাঁচার ভেতরে তার হৃৎপিণ্ড ধরফড় করছে। যেন কুমোরটুলিতে মূর্তি গড়ার প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে, এবার মাটির প্রলেপ লাগিয়ে দিলেই হলো। সে একটু ঝুঁকে বিছানা থেকে চাদর তুলে নিয়ে হেনা সেনের শরীরে ছড়িয়ে দিলো, তারপর বললো, 'উত্তেজিত হবেন না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে।'

'কে বলেছেন?' হেনা সেনের স্বরে বিস্ময়।'

'মুখ্যমন্ত্রী।'

'আঃ আপনি অদ্ভুত লোক তো।'

'উনি তো অন্যায় কিছু বলেন নি। আমাদের যা গিয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করে কি লাভ! আমরা তো অমরত্ব পেলাম, তাই না?'

কিসের বিনিময়ে অমরত্ব পেলাম ? কে চায় এমন অমরত্ব? অন্তত আমি চাই না। আমার ওই শরীরটাকে কৃপণের মতো লোভী হাতগুলোর আওতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। কেনো, কিসের জন্যে? আমি তো তার ব্যবহারই জানলাম না তার স্বাদ আমার অচেনা রয়ে গেলো চিরজীবনের জন্যে কে চায় এই অমরত্ব?'

'উত্তেজিত হবেন না। আপনি বিশ্বাস করুন আমি কোনো অভিসন্ধি নিয়ে আসি নি।'

'তাহলে কেনো এসেছেন?' 'বলবো। আগে জামাটা পরে নিন।'

'আমি আর শাড়ি পরতে পারবো না। আঃ।'

' কেনো পারবেন না? অফিসে আজ তিনজন মহিলাকে শাড়ি পরে যেতে দেখেছি।'

'অফিসে? অফিসে লোক গিয়েছিলে? মেয়েরা গিয়েছিলো?'

'হ্যাঁ। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সবাইকে স্বাভাবিকভাবেই চলতে যাঁরা অফিসে যাবেন না তাদের পাতাল-নরকে ঠেলে দেয়া হবে।'

'পাতাল-নরকে?' হেনা সেনের স্বরে আবার বিস্ময়।

'হ্যাঁ। ওই যে টিউব রেল হচ্ছিলো। ওটা কমপ্লিট হতে সময় লাগবে। কিন্তু এখন তেমন ট্রান্সপোর্ট প্রব্লেম নেই তাই টিউবের মুখ বন্ধ করে পুলিশ অপরাধীদের ওখানে ফেলে দেবে।'

'আমি অফিসে যাবো না। এই মুখ, শরীর নিয়ে যেতে পারবো না।'

'তাহলে পাতাল-নরকে যেতে হবে। ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমি দেখবো। আপনার জামা পরুন আগে। আমি কি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবো?'

হেনা সেনের মুখ নিচু হলো। স্বপ্নেন্দু মনে হলো হেনা লজ্জা পেয়েছে। সে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হেনা সেনকে দেখতে পেলো।

ছবির বাঁধানো ফ্রেমের হেনা সুন্দর হাসছে। সেই মোহনী শরীর আর মুখের হাসিতে ঘর যেন আলো হয়ে গেছে। এই ছবিটাকে খুলে ফেলা উচিত।

স্বপ্নেন্দু মনে মনে বললো।

ঠিক তখন হেনা সেন বিছানা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে, 'বসুন।'

স্বপ্নেন্দু ফিরে তাকালো! তাহাওয়ালা ম্যাক্সি পায়ের গোড়ালি ছুঁয়েছে। মাথায় একটা কালো রুমাল বাঁধা। স্বপ্নেন্দু বললো 'সুন্দর।'

হেনার মাথা সামান্য নড়লো, 'আবার বানানো কথা!'

'বিশ্বাস করুন।' স্বপ্নেন্দুর স্বর ভারি হলো।

'আপনি কি পাগল?

'তাই মনে হচ্ছে? জানলাগুলো খুলে দিই?'

'আলো আসবে যে।'

'আসুক। এখন থেকে খোলা হাওয়ায় বের হবেন।'

'আমি পারবো না, লজ্জা লাগছে, কেমন-ভাবতে পারছি না।'

'উহুঁ। বরং দেখবেন পাঁচজনে আপনার দিকে তাকাবে।'

'আবার?' হেনা একটা চেয়ারে বসলো। পাশে স্বপ্নেন্দু।

'আপনি আমার কাছে কি চান বলুন তো?'

'আপনার কি মনে হয়?'

'আমি বুঝতে পারছি না। আমার তো দেয়ার মতো কিছুই নেই। সত্যি বলতে কি এই কণ্ঠস্বর ছাড়া আমি আর মেয়েও নই।'

'ভুল হলো। কণ্ঠে আমাদের স্বর নেই। ওটা বক্ষস্বর হবে। আর তাই যদি বলেন তাহলে আমিও তো পুরুষ নেই। একমাত্র স্বর সেটা বোঝা যায় আর হয়তো হাড়ের গঠনে। তাই না?'

'তাহলে? কি চান আপনি?'

'ওঃ, আমি এই কথাটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে হবে না। কাল থেকে অফিসে যাচ্ছেন?'

'কাল থেকে? না না।'

বেশ যেদিন যাবেন বলবেন। আমি একটা ছুটির দরখাস্তে আপনার সই করিয়ে নিয়ে যাবো। বাড়িতে বইপত্র আছে?'

'আপনি এমনভাবে কথা বলছেন, যেন কিছুই হয় নি।'

'মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যে এসব নিয়ে একদম মাথা ঘামাবেন না।'

'কি নিয়ে মাথা ঘামাবো?'

'বলবো?'

'বলুন।'

'আপনার মায়ের সঙ্গে আলোচনা করুন একটা সমস্যা নিয়ে।'

'কি সমস্যা?'

'আপনার বিয়ে হয়ে গেলে উনি কোথায় থাকবেন? আপনার সঙ্গে থাকতে ওঁর আপত্তি আছে কিনা? নাকি এখানেই থাকতে চান!'

'বিয়ে? আপনি সুস্থ?'

'অবশ্যই।'

'আমাকে কে বিয়ে করবে? আমি তো আর মেয়েই নই।'

এই সময় দরজায় হেনার মা এসে দাঁড়ালেন। স্বপ্নেন্দু তাঁকে আগে লক্ষ্য করেছিলো। সে উঠে দাঁড়ালো, 'আসুন। আপনার মেয়ে সমানে ঝগড়া করে যাচ্ছে।'

'মোটেই না।' হেনা মৃদু আপত্তি করলো।

'সে কি? একটু আগে আপনি চেঁচাচ্ছিলেন না! আমাকে চিনতে পর্যন্ত চাইছিলেন না। বসুন মাসীমা।'

'না বসবো না। তুই ভালো আছিস?'

জবাব দিলো না হেনা। একটু চুপ করে বললো, 'তুমি একটা কাপড় বাঁধো তো মাথায়, বিশ্রী দেখাচ্ছে।'

মহিলা ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আমাকে আর কি দেখাবো! ভাগ্যিস তুমি এলে বাবা। নইলে ওকে নিয়ে যে কি করতাম আমি! কোনো কথা শুনতে চাইছিলো না। শরীর নিয়ে ওর চিরকালই-।'

'আঃ চুপ করো তো।' মাকে থামিয়ে দিলো হেনা সেন।

স্বপ্নেন্দু বললো, 'আপনা এক কাজ করুন। বাইরে হেঁটে আসি। নইলে একা একা ঘরে বসে থাকলে আরও মন খারাপ হবে।'

হেনার মা বললেন, 'না বাবা। আমার বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না। তোর ইচ্ছে হলে ঘুরে আয়। স্বপ্নেন্দু যখন বলছে।' হেনার মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হেনা কোনো জবাব দিলো না। স্বপ্নেন্দু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলো, কি হলো?'

'আজকে একদম ইচ্ছে করছে না।'

'ঠিক আছে। কাল তৈরি থাকবেন। এলেই বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'কাল আপনি আসবেন?'

'নিশ্চয়ই। আর এখন কেউ কিছু বলবে না। পাড়াতেও দুর্নাম হবে না।'

'আশ্চর্য!'

'তার মানে?'

'সত্যি সত্যি আপনি আসবেন?'

'হ্যাঁ। বললাম তো লোকলজ্জার কোনো কারণ নেই।'

'আপনি আমাকে ঠকাচ্ছেন না তো?'

'ঠকিয়ে আমার কি লাভ?'

'আমার খুব ভয় করে।'

'কিসের ভয়।'

'পুরুষজাতটাকে। ওরা মেয়েদের শুধু শরীরের জন্যেই চায়। সেটা মিটে গেলে আর তাকিয়েও দ্যাখে না। তাই-?'

'এখন তো আর সেসব প্রশ্ন ওঠে না।'

হেনা সেন যেন চেতনায় ফিরলো, 'তা বটে। সেজন্যে আরও গোলমাল লাগছে। আপনি যা বলছেন সব কি সত্যি?'

'সব। আর এইসব পুরোনো ভাবনাগুলোকে এখন বাতিল করুন। মনটাকে পরিষ্কার করুন দেখবেন সব কিছু হালকা লাগবে। কলকাতা শহরটার চেহারা একদম পাল্টে গেছে। আপনি কেনো স্মৃতি আঁকড়ে থাকবেন?'

'পাল্টে গেছে মানে?'

'নদীতে জল নেই, পুকুরগুলা খাঁ খাঁ করছে। একটাও গাছ নেই, ঘাস বাগান ফুল সব ছাই হয়ে গেছে।' বলতে বলতে থমকে দাঁড়ালো স্বপ্নেন্দু, 'না সব নয়। একটা ফুল আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে আছে, এখনও।'

'একটা ফুল? কোন্ ফুল, কোথায়?'

স্বপ্নেন্দু হাসলো, শব্দ হলো, 'সেটা বলা যাবে না। একমাত্র আমিই তার হদিশ জানি।'

'আঃ আবার সাজানো কথা!'

স্বপ্নেন্দু বুঝতে পারলো। হেনা মনে করেছে স্বপ্নেন্দু তার কথা বলছে। যেন হেনাকে একটা ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছে স্বপ্নেন্দু। সে আর ভুল ভাঙলো না। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি সাজানো কথা বলি না।'

হেনা সেন উঠলো, 'আজ যে আমার কি হলো!'

'কি হলো?'

'আপনি আসার আগে মনে হচ্ছিলো,থাক বাদ্ দিন।'

দরজা বন্ধ করার আগে হেনা জিজ্ঞাসা করলো, 'সত্যি কথা বলুন তো, আমি কি খুব কুৎসিত হয়ে যাই নি?'

স্বপ্নেন্দু বললো, 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী মোটেই না।'

হেনার মাথাটা নিচু হলো, 'আপনি আমার মনটাকে পাল্টে দিয়ে গেলেন। আবার কবে আসবেন?'

'কাল।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।' স্বপ্নেন্দু আর দাঁড়ালো না।

বাইরে বেরিয়ে স্বপ্নেন্দু হাঁটার গতি বেড়ে গেলো। জয় করায়ত্ত। এত সহজে যে সে হেনা সেনকে পেয়ে যাবে তা কল্পনায় ছিলো না। একথা ঠিক যদি এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটতো তাহলে ব্যাপারটা এত সহজ হতো না। হেনা সেন তাকে নানাভাবে যাচাই করতো এবং হয়তো শেষ পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলতো।

স্বপ্নেন্দু ভাবলো, এবার একটা দিন ঠিক করে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে ওরা যাবে। হ্যাঁ, তার শরীর নেই। পুরুষ মানুষের কোনো চিহ্ন তার নেই। হেনার মধ্যে মহিলাত্ব পাওয়া যাবে না। কিন্তু ওগুলোই কি সব? পুরুষ এবং মহিলা কি দুজনে শরীরের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজবে শুধু? তাদের মনের আনন্দ বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। হেনা সঙ্গে থাকতে সে ওই আনন্দ পাবেই। দুজনে মিলে গল্প করবে, ভালবাসবে, বেড়াতে যাবে। আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভেবে স্বপ্নেন্দু শিহরণ বোধ করছিলো।

বাস থেকে নেমে চোখের ওপর একটা ঘটনা ঘটতে দেখলো সে। একজ মহিলা অলসভাবে হাঁটছিলেন। তাঁর হাতে একটা রেডিও সেট। বোধহয় সারাতে দিয়েছিলেন ওইরকম কিছু। হঠাৎ একটা লোক তাঁর হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে দৌড়তে শুরু করলো। মহিলা চিৎকার করে কিছু ধাওয়া করতে কোত্থেকে আর একটা লোক উদয় হয়ে তাঁর শাড়ির আঁচল টেনে ধরলো। পত পত করে শাড়িটা খুলে গেলো। মহিলা চেষ্টা করেও সেটাকে আটকাতে পারলেন না। দ্বিতীয় লোকটা শাড়িটা হাতে নিয়ে উল্টোদিকে

দৌড়ালো। স্বপ্নেন্দু এতটা উত্তেজিত হয়েছিলো যে সে পিছু ধাওয়া করলো দ্বিতীয় লাকটায়। কিন্তু দূরত্ব এত বেশি যে তার পক্ষে ধরা সম্ভব বুঝে চিৎকার করতে লাগলো যাতে অন্য লোক লোকটাকে ধরে। কিন্তু সে দেখলো চারপাশের মানুষজন সে-চেষ্টাই করছে না। বরং হাসাহাসি শুরু হয়েছে। স্বপ্নেন্দু রাগত গলায় বললো, 'আপনারা হাসছেন? লজ্জা করছে না? একজন মহিলাকে বেইজ্জত করছে সবার সামনে। ছি ছি!'

জনতার একজন বললো, 'কে মহিলা? উনি মহিলা তার প্রমাণ আছে?' থমকে গেলো স্বপ্নেন্দু, 'শাড়ি ব্লাউজ পরেছেন দেখছেন না?'

'আপনি শাড়ি ব্লাউজ পরলে মশাই একই রকম দেখাবে। শোনেন নি কাল থেকে ট্রাম-বাসে লেডিজ সিট উঠে যাচ্ছে।'

লেডিস সিট উঠে যাচ্ছে? ততক্ষণে ছিনতাইকারী হাওয়া হয়ে গিয়েছে। স্বপ্নেন্দু মহিলার দিকে তাকালো। দু'হাতে জামা ঢাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। স্বপ্নেন্দু বুঝলো পুরোন সংস্কার এবং অভ্যেস ত্যাগ করতে পারেন নি মহিলা।

সকালে শহরটা বেশ ছিমছাম ছিলো। দুপুরে কি হয়েছিলো স্বপ্নেন্দু জানে না। হেনা সেনের বাড়িতে যতক্ষণ ছিলো বাইরের পৃথিবীর কথা খেয়াল ছিলো না। কিন্তু বিকেলে মনে হলো কলকাতা যেন স্বচ্ছন্দ নয়। মানুষগুলোর ব্যবহার পাল্টে গিয়েছে।

অবনীদা বসেছিলো দোকানে। স্বপ্নেন্দু দেখলো দোকানটা ন্যাড়া। জিনসপত্র কিছুই নেই। স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করলো, ' কেমন আছেন অনবীদা? আমি স্বপ্নেন্দু।'

'দেখছো তো ভাই। এগুলো নিয়ে ওরা কি করবে জানি না তবু নিয়ে গেলো।'

'কি নিয়ে গোলো?'

'চায়ের কাপ-ডিস-কেটলি জলের ড্রাম!'

'কারা নিলো।'

'এখন তো চেনা মুশকিল। দল বেঁধে সাত আটজন এসেছিলো। লুট করে নিয়ে চলে গেলো। বললাম কোনো কাজে লাগবে না ভাই কিন্তু শুনলো না। তুমি কিছু দ্যাখোনি?'

'মনে হলো কিছু একটা হয়েছে।'

'দোকানপাট লুঠ হচ্ছে, বড়ো রাস্তার কাপড়ের দোকানগুলো ভেঙে সবাই যে যার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। মিষ্টির দোকান লুঠ করে সেগুলো চটকাচ্ছে মানুষগুলো। এসব কেনো হচ্ছে জানো?'

'কেনো?'

'সবাই বুঝে গেছে তাদের আর পাওয়ার কিছু নেই। পুলিশ এসেছিলো লরিতে চেপে। ধাওয়া করতে সবাই পালালো। কিন্তু এর মধ্যেই মানুষ জেনে গেছে পুলিশের পুরোন বন্দুকগুলো অকেজো হয়ে গিয়েছে। নতুন যে অস্ত্রের কথা শোনা যাচ্ছে তা কেউ চাক্ষুষ করে নি। এখন তাই পুলিশ দেখলে কেউ ভয় পায় না।'

'অকেজো হয়ে গিয়েছে মানে?'

'ট্রিগার টিপলেও গুলি বের হচ্ছে না। বোধহয় গুলিগুলোর বারোটা বেজে গেছে। কি ভয়ঙ্কর কথা! চারিদিকে এখন অরাজকতা শুরু হয়ে যাবে।

তুমি জানো আমার ছেলেটা আমাকে কি বলেছে?'

'কি?'

'বললো, একদম চোখ রাঙাবে না। তোমার খই না পরি? আমি আমার মতো থাকবো তুমি নাক গলাবে না। জীবনে যা কিছু সবই তো ভোগ করেছো। আমি কি পেলাম? বোঝ! আমার ভয় হচ্ছে আমাদের সংসারগুলো পর্যন্ত ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। নরক, নরক এসে গেলো।' এইসময় আর একটা কঙ্কাল এস হাজির হলো। তার দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলো না স্বপ্নেন্দু। লোকটা বললো, 'টিভি চালু হয়েছে? অনবীদা মাথা নাড়লো, 'জানি না। ওটা ছেলে, বগলদাবা করে সরে পড়েছে। বাড়ির সব জিনিস সে হাওয়া করে দিচ্ছে।'

'কেন?'

'এখন পড়ে থাকা নাকি মূর্খামি। এমন কি সে তার মাকে বলছে, তুমি আর ম কোথায়, মা হতে হলে তো মেয়ে মানুষ হতে হয়।'

স্বপ্নেন্দু আর দাঁড়ালো না। তার মন খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছিলো। পাশের বাড়ির জানলা একটি মুখ চিৎকার করে উঠলো, কে কে?'

'আমি স্বপ্নেন্দু।'

'ও তুম। আমি তোমার হরিজ্যাঠা। কিন্তু তুমি স্বপ্নেন্দু তার প্রমাণ কি?

আজকালতো কাউকে বোঝা যায় না। বাপের নাম বলো?

'আমার বাবার আপনার বন্ধু ছিলেন। ঈশ্বর তারকনাথ-।'

'ও বুঝেছি। উই হ্যাভ লস্ট আওয়ার আইডেন্টিফিকেশন। সাম্যবাদ। সাম্যবাদ কম্যুনিজম! তোমার মুখ্যমন্ত্রী যা বোঝাবেন তাই বুঝতে হবে? বাবা ছেলের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারে না। মেয়েকে আর মেয়ে বলে মনে হয় না। হ্যাঁ, শোনো। সবসময় দরজা বন্ধ রাখবে বাবা। কোনো সিকিউরিটি নেই। যে কোনো মুহূর্তেই বাড়ি লুঠ হতে পারে। বড়ো রাস্তায় কি হয়েছে শুনেছো?'

'শুনেছি।'

'দাঙ্গার সময় এরকম হতো। তখন কারণটা বোঝা যেত। আমি তো দরজা খুলছি না। যা কথা বলার জানলা দিয়ে বলো।'

স্বপ্নেন্দু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলো। এই সিঁড়ির মুখে কোনো দরজা নেই। ওপরে উঠে পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাট। নিজে দরজা থাকলে কে বন্ধ কবে সেই ঝামেলায় ওটা খোলা রাখা রয়েছে।

ঘরের দরজা বন্ধ করে স্বপ্নেন্দু টেবিলের কাছে চলে এলো। চাদর রাতে ঝাপসা লাল রঙ চোখে পড়লো। সন্তর্পণে বড়ো জারটা খুলতেই ছোটো কাঁচের বাটির মধ্যে রক্তগোলাপটাকে স্পষ্ট দেখা গেলো। সেই একই রকম সতেজ, ডাঁটা পাপড়ি। আর কি আশ্চর্য, সেই জলের ফোঁটাটাও অবিকল রয়ে গেছে। স্বপ্নেন্দু বুঝতে পারছিলো একটু হাওয়া স্পর্শ পেলে ফুলটা হয়তো ছাই হয়ে যাবে। সে কৃপনের মতো ফুলটার দিকে তাকালো। আঃ, হৃৎপিণ্ড ক্রমশ শান্তিতে ভরে যাচ্ছে। কি আরাম।

একটা তোয়ালে নিয়ে মুখ পরিষ্কার করলো সে। ধুলো লেগেছিলো করোটিতে। তোয়ালেতে বেশ ময়লা। নিজের জামাকাপড় খুলে সে খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। জানলা দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাওয়া ঢুকছে ঘরে। ঝিরঝিরে হাওয়া তার হাড়ের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছন্দে এপাশ ওপাশ করছে। শীতকালে কি হবে? তখনকি হাড় কনকন করবে?

স্বপ্নেন্দু মনে হেনা সেনের মুখ ভেসে উঠলো। নরম, চিবুক, গলার স্বরে এখনও আগের মমতা। হেনা কি তাকে ভালোবেসেছে? স্বপ্নেন্দু হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠলো। আর কিছু চায় না সে। শুধু হেনা ভালোবেসে তার পাশে থাক। ওর সেই মায়া-চোখ আদুর গাল, মোহনী হাসি, দম-বন্ধ করা বুক নাই থাকলো কিন্তু হেনা তো আছে। আজ বিকেলে যা দেখলো এবং শুনলো তাতে কলকাতার পরিবেশটা কাল কি হবে অনুমান করা যাচ্ছে না। মানুষের চরিত্র খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেনাকে বিয়ে করা দরকার। স্বপ্নেন্দু বিছানা ছেড়ে উঠলো। তারপর টেলিফোন ডাইরেক্টরীরি দেখে ম্যারেজ রেজিস্টারকে ফোন করলো।

'হ্যালো। ম্যারেজ রেজিস্টার অফিস?'

'হ্যাঁ। কি চাই?'

'এখন বিয়ে করতে গেলে নোটিশ দিতে হয়?'

'বিয়ে? কে বিয়ে করবে?'

'আমি।' কথাটা বলতে একটু লজ্জা বোধ করলো স্বপ্নেন্দু।

'আপনি কি পাগল হয়ে গিয়েছেন?'

'মানে? এটা কি ম্যারেজ রেজিস্টারের অফিস নয়? এস কে রায়-।

'হ্যাঁ ঠিকই।' 'আপনার ওখান থেকে আমার এক বন্ধু মাস তিনেক আগে রেজিস্ট্রি করেছে। পাগল বলছেন কেনো?'

'আপনি কাকে বিয়ে করবেন?'

'তিনি ছেলে না মেয়ে?'

'কি আজেবাজে কথা কথা বলছেন?'

'মাপ করবেন। এখন তো কেউ আর ছেলে কিংবা মেয়ে প্রমাণ করতে পারছেন না। ফলে বিয়ে হবে কি করে? পুরোন আইনে আছে পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে বিয়ে হতে পারে। পুরুষে পুরুষে কিংবা মহিলায় মহিলায় অথবা নপুংসকদের মধ্যে বর্তমানে বিবাহের কোনো আইন নেই। বুঝলেন মশাই?' হাসলেন রেজিস্টার। শব্দ হলো।

'সে কি? এখন তাহলে বিয়ে হবে না?'

'না। তাছাড়া আপনি তো তাজ্জব মানুষ। যেখানে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষ উন্মাদ হয়ে উঠেছে, সম্পর্কে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে সেখানে আপনি বিয়ের কথা ভাবছেন? ইটস এ নিউজ। খবরের কাগজে ছাপা হওয়া উচিত।' হে হে করে হেসে উঠলেন রেজিস্টার।

বিরক্ত এবং হতাশ স্বপ্নেন্দু বললো, 'জ্ঞান দেবেন না। তাহলে আপনি আছেন কি করতে? আপনার চাকরি তো গেলো!

'গেলো। দু'হাতে এতকাল কামিয়েছি ভাই। সব গেলো। তবে একটা সুখবর আছে। আপনি সরকারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে পারেন।'

'সার্টিফিকেট?'

'হ্যাঁ। আপনি অমুক চন্দ্র অমুক, এক্স শ্রীমতী অমুকের সঙ্গে এক সঙ্গে থাকতে চান। এ বিষয়ে এক্স শ্রীমতীর কোনো আপত্তি নেই। তাকেও সই করতে হবে। সরকার আপনার পাঁচ বছর একত্রে থাকার অনুমতি দেবেন।'

'পাঁচ বছর?'

'স্টেয়িং টুগেদার। তারপর ইচ্ছে করলে ছাড়াও যেতে পারে, আবার ওটা রিনিউ করাতেও পারেন। আগে বিবাহিত জীবন কতদিন টিকতো? পঞ্চাশ-ষাট বড়জোর সত্তর। তার বেশি নয় কিন্তু এখন অনন্ত জীবন। তাই এই ব্যবস্থা। আগে হলে এতো কথার জন্যে দক্ষিণা চাইতাম, এখন কি ঠিক করবেন জানাবেন। আমিই না হয় সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করে দেবো।'

'সার্টিফিকেট যদি না চাই?'

'মিটে গেলো গোল।' ওপাশ থেকে লাইনটা কেটে দেয়ার শব্দ হলো রিসিভার নামিয়ে রেখে স্বপ্নেন্দু কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। যাঃ শালা, এই কঙ্কাল শরীরে বিয়েরও ব্যবস্থা নেই। ওর মনে হলো মুখ্যমন্ত্রী এই পরিবর্তিত অবস্থার কথা এতটা না ভাবলেও পারতেন। হেনা সেনের মনে পুরোন সংস্কার জড়িয়ে আছে। বিয়ে ছাড়া একসঙ্গে থাকতে চাইলে হয়! যতই সুন্দরী হও, আধুনিকা হও বিয়েটি চাই।

এই সময় বাইরে খুব হৈচৈ শোনা গেলো। স্বপ্নেন্দু জানলায় গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো তিন-চারজন লোক একটা লোককে ঘিরে ধরেছে। লোকটা মোটরবাইকে বসে। লোকগুলা ওকে টানাটানি করছে। লোকটার কঙ্কাল বেশ রোগাপটকা। হঠাৎ মুখ তুলে সে স্বপ্নেন্দুকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'দেখুন, এরা আমার বাইক কেড়ে নিতে চাইছে। দিনদুপুরে ছিনতাই করছে!' লোকগুলো হাসলো। একজন বললো, 'এ বাইক তোর প্রমাণ কি?'

'আমার লাইসেন্স আছে। এই দেখুন!'

হে হে হে। এ তো রক্তমাংসের মানুষের ছবি। তোর ছবি তার কি প্রমাণ?'

লোকটা প্রতিবাদ করছিলো। কিন্তু ওরা ওকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে বাইকটাকে নিয়ে চলে গেলো।

স্বপ্নেন্দু সরে এলো জানলা থেকে। হঠাৎ সমস্ত শহরের মানুষ পাগল হয়ে গেলো নাকি! সে রেডিও খুলতেই মুখ্যমন্ত্রীর গলা ভেসে এলো, 'বন্ধুগণ। আমরা যে পরিবর্তিত অবস্থায় পৌঁছেছি তাকে কাজে লাগানোর জন্যে আমি কলকাতাবাসীর কাছে আবেদন রাখছি। আপনারা এই পরিস্থিতর সুযোগ নিন। এখন অবস্থা অনেক উন্নত। দলে দল মানুষ অফিস কাছারিতে যাচ্ছেন। ট্রাম-বাসে সহজে চলফেলা করছেন। কলকাতায় আর কখনও খাদ্যাভাব জলাভাব অনুভূত হবে না। কিন্তু কোনো কোনো কু লোক এত সুন্দর ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে চাইছেন। তারা সমস্ত কলকাতায় অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইছেন। আমি এই বলে তাদের সতর্ক করে দিতে চাই কোনোরকম অশান্তি সরকার সহ্য করবে না। জনসাধারণকে অনুরোধ করছি এর প্রতিবাদ করতে। আপনারা সবাইকে বন্ধুর মতো গ্রহণ করুন।'

এইসময় দরজায় শব্দ হলো। রেডিওটাকে বন্ধ করে স্বপ্নেন্দু মুখ ফেরালো দ্বিতীয়বার শব্দটা হলো। কে এলো এই সময়ে? সন্ধ্যে হয়ে আসছে। সতর্কবাণী মনে পড়লো। পরিচিত ব্যক্তি ছাড়া চট করে দরজা খোলা উচিত হবে না। স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করলো, 'কে ওখানে?'

'আমি। স্বরটি মহিলার।

'আমি কে?'

'আহা, খোলোই না!'

স্বপ্নেন্দুর হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠলো। হেনা না? ওর মতো স্বর। হেনা এসেছে ভাবাই যায় না। সে দ্রুত দরজার পাল্লা খুলতেই দেখলো মাথায় ঘোমটা দিয়ে হাতে ব্যাগ নিয়ে মহিলা ঘরে ঢুকে পড়লো। কিন্তু এ হেনা নয়, নিশ্চয়ই নয়।

'কি ব্যাপার?' মহিলা মুখ তুলতেই হোঁচট খেলো। না, এ হেনা নয়। হেনার চিবুক বড় আদুরে, মসৃণ এবং গোলাকার।

'আমাকে চিনতে পারছো না? হায় ভগবান। আমি অত্রেয়ী।'

'আত্রেয়ী?'

'আমি ভেবেছিলাম গলার স্বরে তুমি চিনবে। তোমাকে তো খুব সেনসিটিভ বলে আমি জানতাম। কি অন্য কোনো মেয়ের কথা ভেবেছিলে?'

'না না।' স্বপ্নেন্দু বুঝতে পারছিলো না আত্রেয়ী কেনো এলো, 'আসলে ব্যাপারটা এত চমকপ্রদ, বলো কি খবর বসো!'

'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে স্বপ্নেন্দু-'

মাথায় ঘোমটাটা সরিয়ে ফেললো আত্রেয়ী। সাদা করোটিটা ক্যাটক্যাট করছে। সেটার আকৃতি গোল। কপালটা উঁচু। চোখের ফুটো দুটো বেশ বড়ো, নাকের ডগা বসা, চিবুক চৌকো। হেনা সেনকে দেখে মনের যে আরাম হয়েছিলো তার বিন্দুমাত্র হলো না আত্রেয়ীকে দেখে। কিন্তু কেমন খসখসে শিরশিরানি বোধ করলো হৃৎপিণ্ডে। স্বপ্নেন্দু জবাব দিলো, 'ভালো।'

'কিন্তু ও নাকি সহ্য করতে পারছে না। আমিও না।'

'এটা তো মেনে নিতেই হবে।'

'সে কথা কে বোঝায় বলো। দরজাটা বন্ধ কর দাও। বাইরে খুব গোলমাল।

'এই অবস্থায় এলে কেনো?' স্বপ্নেন্দু দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

'না এসে উপায় ছিলো না। আমি একটা পাগলের সঙ্গে থাকতে পারি না।'

'পাগল?'

'হ্যাঁ। ও পাগল হয়ে গিয়েছে।'

'সে কি? কেনো?'

'কি বলবো তোমাকে! ও পুরুষহীন হয়ে পড়েছিলো। অনেক চিকিৎসার পরও বোধহয় সেরে আসছিলো। এই সময় ঘটনাটা ঘটতে ও পাগল হয়ে গেলো। এই হারানোটা ও স্ট্যান্ডড করতে পারছে না। কাল আমাকে মেরেছে। এরপর আমি থাকি কি করে? না, আর একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়।' এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে ঈষৎ হাঁপাতে লাগলো সে।

স্বপ্নেন্দু বললো, 'বসো।'

চেয়ারে বসে আত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি অপছন্দ করছো?'

'না তো। আমি তোমাকে বসতে বললাম কেনো?'

'কিন্তু আমি আর ফিরবো না। আমি তোমার সঙ্গে থাকবো।'

'আমার সঙ্গে থাকবো?' এবার চমকে উঠলো স্বপ্নেন্দু।

'হ্যাঁ। আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। আমি জানি তুমিও আমাকে চেয়েছিলে।'

'সে তো ছাত্রাবস্থায়!'

'হ্যাঁ। তখন আমি ভুল করেছিলাম। গ্রেট মিসটেক। এখন সেটা সংশোধন করে নিতে চাঁই। আমরা তো অমর হয়ে গেছি, কোনো মৃত্যু ভয় নেই। আমরা চিরজীবন পরস্পরকে ভালবাসবো।' আত্রেয়ী এগিয়ে এলো কয়েক পা, 'আমি প্রমাণ করে দেবো ভালবাসা কাকে বলে!'

স্বপ্নেন্দু চমকে উঠলো, 'কি আজেবাজে কথা বলছো? তোমার স্বামী জানতে পারলে কি হবে ভেবেছো? তাছাড়া-।'

'কিছুই হবে না। কারণ আমি তার স্ত্রী নই।'

'স্ত্রী নও মানে? তোমরা বিবাহিত।'

'ছিলাম। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমি আর মহিলা নই। মানে যেহেতু আমার ফিমেল অর্গানগুলো নেই তাই ও আমাকে স্ত্রী হিসেবে ক্লেইম করতে পারে না। তাছাড়া ও নিজেও তো পুরুষ নেই।' শব্দ করে হাসলো আত্রেয়ী, 'এখন পৃথিবীতে স্ত্রী পুরুষ আলাদা করে নেই। কোনোরকম পার্থক্য থাকছে না। এখন একটাই পরিচয় আমাদের আমরা মানুষ।'

ফাঁপরে পড়লো স্বপ্নেন্দু। সে বললো, 'কিন্তু তুমি তোমার মা-বাবার কাছ চলে যেতে পারতে। যদি প্রয়োজন হয় আমি পৌঁছে দিচ্ছি। 'তারা তো সব পাটনায়। শোনেনি, কলকাতার সঙ্গে বহির্বিশ্বের কোনো যোগাযোগ নেই। তাছাড়া তুমি কি আমাকে পছন্দ করছো না?' তেজী ভঙ্গিতে কথা বললো আত্রয়ী।

'না না, সেকথা হচ্ছে না। তুমি হঠাৎ এখানে উঠলো লোকে বলবে কি?'

'লোকের আর কাজ নেই যে এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবে। তাছাড়া আমি যে মেয়ে তাই প্রমাণ করবে কে? স্বপ্নেন্দু!'

'বলো?'

আত্রেয়ী এগিয়ে গেলো স্বপ্নেন্দুর কাছে, 'আমি ভুল করেছিলাম। এতকাল একটুও শান্তি পাইনি। তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না।'

'কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না এ হয় না।'

'কেনো হয় না। পৃথিবীর যে কেনো মেয়ের তুলনায় আমি তোমাকে বেশি ভালবাসবো। তুমি আমার সঙ্গে সাতদিন থাকো। তারপর যদি তোমার আমাকে খারাপ লাগে তাহলে আমি কথা দিচ্ছি আর বিরক্ত করবো না।' কান্নার শব্দ উঠলো এই ঘরে। জল নেই, শুধু শব্দে বোঝা যাচ্ছে আত্রেয়ী কাঁদছে।

স্বপ্নেন্দু খুব নার্ভাস বোধ করছিলো। আত্রেয়ীকে ছাত্রাবস্থায় তার ভালো লাগতো ঠিকই কিন্তু কখনও প্রেম বলে যে ব্যাপার তা মনে আসেনি। অথচ এখন আত্রেয়ী সেই রকম চাপাতে চাইছে। বাইরে এখন বেশ অন্ধকার। তাছাড়া রাস্তার অবস্থা যা তাতে এই রাতটা

কোথাও যেতে বলা উচিত হবে না। আজকের রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে দিয়ে কাল সকালে এর বিহিত করতে হবে।

স্বপ্নেন্দু একদম প্রস্তুত ছিলো না। তার কথাটা শেষ হওয়া মাত্র আত্রেয়ী ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো। অদ্ভুত অনুভূতি হলো স্বপ্নেন্দুর। তার বুকের হৃৎপিণ্ডে মুখ রেখে আত্রেয়ী বলছে, 'তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি।' আর তার হৃৎপিণ্ড কাঁপছে। হাড়ে হাড়ে ঘষা লাগায় শব্দ হচ্ছে। কোনো শারীরিক অনুভূতি নেই। কোনো চাঞ্চল্য নেই। বরং হাড়ের সঙ্গে হাড়ের স্পর্শে একটা অস্বস্তিকর শব্দ কানে আসছে।

অনেক কষ্টে স্বপ্নেন্দু আত্রেয়ীকে ছাড়াতে পারলো। স্বপ্নেন্দু ভেবে পাচ্ছিলো না কি করবে! আত্রেয়ী তার বুকে মুখ রাখার সময় তার খারাপ লেগেছিলো কি? একমাত্র ওই শব্দটি তাকে সচেতন করেছিলো। তাছাড়া সে যে নরম হয়ে পড়েছিলো, বেশ আরাম হচ্ছিলো তা কি মিথ্যে? যে কোনো মেয়ে বুকে মাথা রাখলেই কি এমন হয়? হেনা সেন যদি জানতে পারে-। ছিঃ। হেনার কথা ভাবতেই দৃশ্যটা তেতো হয়ে গেলো। সে আত্রেয়ীকে কথা ঘোরাবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলো, 'এলে কি করে? রাস্তায় তো গোলমাল হচ্ছে।

'অনেক কষ্টে এসেছি! একটা বাসে উঠেছিলাম। ওরা লেডিজ সিটে বসতেই দিলো না! বললো, এখন কেউ লেডিজ নয়। নেমেই দেখি একটা কাপড়ের দোকান লুট হচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি পা চালাতে তিনটে লোক আমর পেছন হাঁটতে লাগলো।' আত্রেয়ী দম নিলো।

'তোমার পেছন পেছন? আগে হলেও কথা ছিলো।'

'না, শরীরের জন্যে নয়। এই শাড়ীর জন্যে। ততক্ষণে আমি এই গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। ওই চায়ের দোকানের লোকটা তখন না থাকলে-।'

'চায়ের দোকান। অবনীদা! অবনীদা তোমায় দেখেছো?'

'ওর নাম বুঝি অবনীদা? উনি তেড়ে উঠতে লোকগুলো চলে গেলো।'

'আমার কাছে আসছো সেটা ওকে বলেছো?'

'হ্যাঁ। আমি যে বাড়িটা গুলিয়ে ফেলে ছিলাম।'

'কিছু বলে নি?' হতাশ গলায় জিজ্ঞাসা করলো স্বপ্নেন্দু।

' কেনো? অবনীদা কি তোমার গার্জেন?'

'তা কেনো হবে?'

'উঃ স্বপ্ন, তুমি এখন লোক নিন্দের ভয়ে মরছো! চলো, তোমার সংসার দেখি।'

'সংসার? আমার আবার সংসার কি। চাকরটা বোধহয় দেশে গিয়ে বেঁচে গেলো? আর কখনও আসবে বলে মনে হয় না। এই তো দুটো ঘর। তুমি ওই ঘরটা ব্যবহার করতে পারো। পরিষ্কার আছে কি না জানি না।

ক'দিন তো ঝাঁট পড়েনি-।'

'ওই ঘর ব্যবহার করবো মানে?'

'তুমি তো আজ রাত্রে এখানে থাকছো!'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু তার জন্যে আলাদা ঘর ব্যবহার করতে হবে কেনো?'

তুমি কি আমার সঙ্গে শোবে না?' আত্রেয়ীর স্বরে বিস্ময়।

'শোনো আফটার অল তুমি মেয়ে, পরস্ত্রী।'

'চমৎকার। একটু আগে তোমাকে বললাম আমি আর কারো স্ত্রী নই। তোমাকে ভালবাসি বলে ছুটে এসেছি। তবু তোমার হুঁশ হলো না। স্বপ্নেন্দু ভয় পেয়ো না, তোমার পাশে শুলে আমার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কোনো চান্স নেই।

'আত্রেয়ী?'

হি হি করে হেসে উঠলো আত্রেয়ী, 'রাগ করো না। এসব কথা আগে উচ্চারণ করতে লজ্জা করতো। এখন একটু আধটু না হয় করি। পাগলামি ছাড়ো, এখন আমরা একসঙ্গে থাকবো। জানো স্বপ্ন, আমি চিরকাল ভাবতাম মানুষ কেনো মানুষকে আত্মিক ভালবাসবে না? কেনো শরীর তার অবলম্বন হবে? একটা মেয়ের ঠোঁট, বুক, পাছা যোনির আকর্ষণে আর একটা ছেলে কুকুরের মতো পেছনে পেছনে ঘুরবে কেনো? ওটাকে ভালবাসা বলে? ছি! যখন শরীরের ওইসব ক্ষণিক যাদু শেষ হয় যাবে, মেয়েটা ছিবড়ে হয়ে যাবে তখন ছেলেটা সেই কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে আর একটা কুকুরীর সন্ধানে ফিরবে! ভাবতেই ঘেন্নায় শরীর গুলিয়ে উঠতো। যাকে বিয়ে করেছিলাম সে তো নর্দমা ঘাঁটার মতো শরীরটা খুঁড়তো। কত মাথা ঠুকেছি কিছুতেই শোনে নি। কিন্তু ঈশ্বর শুনেছিলেন। নইলে হঠাৎ সে নপুংসক হয়ে যাবে কেনো? অথচ আবার সেটা ফিরে পাওয়ার জন্যে কি চেষ্টা না পেয়ে পাগল হয়ে গেলো। কার্স, কার্স! পুরুষদের ওই পাশবিক অহঙ্কার আমি সহ্য করতে পারি না। ঈশ্বর আমার মনে কথা বুঝেছেন।'

স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে শুনছিলো, 'তুমি পুরুষদের ভালবাসতে চাইনি?'

'হ্যাঁ চেয়েছি। কিন্তু তাতে শরীর থাকবে না। প্লেটোনিক লাভ হলো অমর। তাতে দেহের কদর্যভঙ্গী থাকে না। স্বর্গীয়। এসো স্বপ্ন, আমরা সেই স্বর্গীয় প্রেমে অনন্তকাল ডুবে থাকি। তুমি আর আমি।' হাত বাড়ালো আত্রেয়ী।

'কিন্তু তুমি যে এই হাত বাড়াচ্ছো, সেটাতেও তো দেহের প্রয়োজন হচ্ছে!'

'না, এই কঙ্কালের হাড়ে রক্ত মাংস নেই। অতএব এটা দেহ কেনো হতে যাবে?'

আত্রেয়ীর দিকে তাকালো স্বপ্নেন্দু। এই মেয়েটাও কি ওর স্বামীর মতো পাগল হয়ে গেলো! হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করলো, 'কিন্তু আমি যদি অন্য কোনো মেয়েকে ভালাবাসি? যদি সে আমাকে সমানভাবে চায়?' হাসলো আত্রেয়ী, 'এখন তো কেউ মেয়ে নয়। সত্যি কি কাউকে ভালবাস?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বিশ্বাস করি না। আমি তাকে দেখতে চাই।'

'বেশ দেখাবো।'

আত্রেয়ীর বসবার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিলো। সে হতভম্ব হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত সে মুখ তুললো, 'তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো স্বপ্ন?'

'মোটেই না। আমি তোমাকে বন্ধু মনে করি।'

'আমিও তাই চাই। এখন দু'জন মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের বেশি কিছু হতে পারে না। তাহলে এমন করে বলছো কেনো?'

এই সময় বাইরে খুব হইচই শোনা গেলো। স্বপ্নেন্দু দ্রুত জানলায় এসে দেখলো নিচের রাস্তায় উন্মত্ত কয়েকটা কঙ্কাল একটি কঙ্কালকে ধরেছে। তারপর তার শরীরে আগুন জ্বালিয়ে দিলো লোকগুলো। জ্যান্ত পুড়িয়ে মারছে ওরা। স্বপ্নেন্দুর মাথা খারাপ হয়ে গেলো। পাগলের মতো ছোটাছুটি কলো লোকটা। একটা আগুনের গোলা রাস্তাময় ছোটাছুটি করছে। তারপর আগুন আপনা আপনি নিভে গেলো লোকটা হো হো করে হাসলো। তার হাড়ে সামান্য পোড়া দাগ ছাড়া একটুও ক্ষতি হয় নি। আক্রমণকারীরা হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো। এবার তারা পালিয়ে গেলো যে যার মতোন। আক্রান্ত লোকটি চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'আমি অমর। হা হা হা মার তোরা, কত মারবি আমায় মার।'

যেন কোনো চলচ্চিত্রের দৃশ্য চোখের সামনে দেখানো হলো। স্বপ্নেন্দুর মনে হলো একবার রাস্তায় গিয়ে দেখা দরকার দূরে চেঁচামেচি চলছে এখন। সে রেডিও খুলতেই কোনো শব্দ পেলো না। আকাশ বাণী কি মৃত? স্বপ্নেন্দু আত্রেয়ীকে বললো, 'তমি বসো আমি একটু দেখে আসছি কি হচ্ছে বাইরে।'

'আমিও যাবো।'

না বলতে গিয়ে থমকে গেলো স্বপ্নেন্দু। এই ঘরে আত্রেয়ীকে একা রেখে যাওয়া উচিত হবে না। টেবিলে জারের তলায় ফুলটা রয়েছে। যদি কোনো খেয়ালে চাদরের ঢাকনা সরায় তাহলে ও ফুলটাকে দেখতে পাবে। সে কোনো ঝুঁকি নিতে চাইলো না।

আত্রেয়ীকে নিয়ে বাইরে আসতেই দেখলো লাঠি নিয়ে কিছু কঙ্কাল ছোটাছুটি করছে। মোড়ের কাছে আসতে সে অবাক হলো। অবনীদার দোকানে একটা কঙ্কাল বসে আছে মূর্তির মতো। তার সঙ্গে এক ফোঁটা সুতো নেই। স্বপ্নেন্দু বললো, 'আচ্ছা অনবীদা কোথায়?'

'আমিই অবনী। স্বপ্নেন্দু?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়ি ফিরে যাও স্বপ্নেন্দু। দেখছো না মানুষ কেমন পাগল হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি চলে যাও।' অবনী বললো।

'কি ব্যাপার?'

'মানুষ জেনে গেছে এই পৃথিবী থেকে তাদের পাওয়ার কিছু নেই। অথচ তাদের অনন্তকাল অমর হয়ে থাকতে হবে। এমন কি আগুনও তাদের দগ্ধ করছে না। সবাই এই দশা থেকে মুক্তি চায় সবাই চিতায় শুতে চায় স্বপ্নেন্দু।'

'সবাই?'

'হ্যাঁ। আমি তো চাই। তুমি জানো না আমার স্ত্রী আজ বেরিয়ে গেছে। সে নাকি যে কোনো উপায়ে আত্মহত্যা করবেই। কত বললাম তবু গেলো।'

'আপনি বাধা দিলেন না?'

'কি হবে দিয়ে! ওরা আমার লুঙ্গিটাকে খুলে নিয়ে গেলো। এই যে উদোম হয়ে বসে আছি খারাপ লাগছে না কিন্তু। বেশ হাওয়া চলছে শরীরে। যাওয়ার সময় আমার ছোটো ছেলেটা বললো মায়ের সঙ্গে থাকবে। জানো, সে বললো মায়ের সঙ্গে? সব নষ্ট হয়ে গেছে, সব সম্পর্ক, কিন্তু স্বপ্নেন্দু শিশুরা এখন মাকে মা বলে জানে।'

অবনীদা বললেন, 'আর দাঁড়িয়ে থেকো না। তোমার সঙ্গে মহিলা আছেন। ওঁর শাড়ি খুলে বেনে ওরা।'

'কিন্তু পুলিশ নেই?'

'না। এখন কিছুই নেই। সবাই লুঠ করতে নেমেছে। কারণ লুঠ করলে যদি খুন হয়ে যায় তাহলে বেঁচে যাবে। এক মৃত্যুর নাম জীবন।'

স্বপ্নেন্দু ফিরে আসছিলো। তাদের পাশের দরজায় এখন একটা অদ্ভুত দৃশ্য। সেই বৃদ্ধ ল্যাম্পপোস্টের গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস ঢুকিয়ে লাফিয়ে পড়লেন। তাকে দেখতে ভিড় জমে গেছে। ঘাড়টা সামান্য বেঁকে গেলো। কিন্তু লোকটা চেঁচাতে লাগলো, 'আমি কি মরেছি? কি দেখছো তোমরা আমি কি মরেছি?'

উলঙ্গ সেই কঙ্কালটার দিকে তাকিয়ে একজন চেঁচালো, 'বললাম মরবেন না তবু শুনলেন না। এখন ঝুলুন ওখানে সারাজীবন। আমি অত ওপরে উঠে দড়ি কাটতে পারবো না। আমি মরেছি,মরলে কেউ চেঁচায়?'

হাউ হাউ করে কাঁদছিলো বুড়ো। 'দড়ি দিয়েও মরলাম না।' তার শরীরটা হাওয়ায় দুলছিলো একজন লাফিয়ে তার পা দুটো ঠেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'দোল দোল, নো হরিবোল।'

স্বপ্নেন্দু আর দাঁড়ালো না। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলো। ঘরে ঢুকে আত্রেয়ী বললো, 'ডিসগাস্টিং। মানুষ কোথায় স্বাভাবিক ভাবে বাঁচার চেষ্টা করবে না মরার জন্যে হেদিয়ে মরছে। এই, আমি শাড়িটা খুলছি।'

স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে দেখলো আত্রয়ী তার শরীর থেকে শাড়ি খুলে ফেললো। জামাটাকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে বললো, 'কেমন দেখাচ্ছে?'

'জাদুঘরে এই রকম মূর্তি দেখেছি।'

'এখন তো কলকাতা শহরটাই জাদুঘর হয়ে গেছে। লোকটা ঠিকই বলেছে, বেশ হাওয়া পাস করছে শরীরের ভেতর দিয়ে। হাড় জুড়োচ্ছে। এসো শুয়ে পড়ি। খুব টায়ার্ড লাগছে।'

'তুমি শোও। আমি-।'

স্বপ্নেন্দু জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। নিচে প্রচণ্ড উত্তেজন কিছু চলছে। ঝুঁকে পড়লো সে। সে বৃদ্ধ এখনও ল্যাম্পপোস্টে দোল খাচ্ছেন এবং সেই অবস্থায় চিৎকার করে উঠেছেন, 'মেরে ফ্যালো, খোকা তুই মেরে ফ্যাল আমাকে। আমি তোর পায়ে পড়ছি খোকা, এভাবে দোল খাওয়াস না।'

নিচে দাঁড়ানো একটা কঙ্কাল খেঁকিয়ে উঠলো। পই পই করে বিলে ছিলাম এখন গলায় গড়ি দিলে কেউ মরে না। এখন শুনলে না কেনো?'

'আমি বুঝতে পারি নি। যেমন করে হোক মেরে ফ্যাল আমাকে। আমি তোর বাপ তোকে হুকুম করছি মার আমাকে।'

'মার বললেই হলো! অত ওপরে ঝুলে তো বেশ মজাসে হাওয়া খাচ্ছো।' কঙ্কালটি আশেপাশে মজা দেখতে আসা মুখগুলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'একটা উপায় বলুন তো? আমার মাথায় কিছু আসছে না।'

জনতা সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিতভাবে নানানরকম পরামর্শ দিতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত স্থির হলো নিচে আগুন জ্বালিয়ে বৃদ্ধকে পুড়িয়ে মারা হবে। সেই মতো প্রচুর কাঠ জোগাড় করলো। তারপর সোৎসাহে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হলো বৃদ্ধের নিচে। দাউ দাউ করে সেই আগুন বৃদ্ধকে গ্রাস করে ফেলতে স্বপ্নেন্দু চোখ বন্ধ করতে চাইলেও পারলো না। তার চোখের পাতা কিংবা মণি নেই তবু সে সব দেখতে পাচ্ছে। এবং দেখে যেতে হবে। আর তারপরেই অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটলো। আগুনের শিখা বৃদ্ধের শরীরের খাঁচাকে লালচে করতে না করতে গলায় ফাঁস পরানো দড়িটা পুড়ে গিয়ে খসে পড়লো রাস্তায়। হইহই করে সবাই ছুটে গেলো বৃদ্ধের কাছে। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াতে পারছে না। কারণ পতনের পর তার পায়ের হাড় ভেঙেছে। কিন্তু তিনি সামনে চিৎকার করে যাচ্ছেন, 'মেরে ফ্যাল আমাকে, মেরে ফ্যাল।'

সবাই মিলে ওকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যেতে স্বপ্নেন্দু মুখ ফেরালো। আত্রেয়ী তার বালিশ জড়িয়ে শুয়ে আছে পাশ ফিরে। ওর হাড়গুলো বড্ড বেশি সাদা। বুকের খাঁচায় নিরেট হৃৎপিণ্ডটার দিকে তাকালো সে। ওটাকে ভাঙা যাবে না, কিছুতেই না। আত্রেয়ী ডাকলো, 'কি দেখছো গো?'

স্বপ্নেন্দু বুঝে উঠেছিলো না সে কি করবে। এই ঘরে আত্রেয়ীর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে শুনলে হেনা তাকে কি ভালোবাসবে? তার সঙ্গে সারাজীবন থাকতে চাইবে?

আত্রেয়ী ডাকলো, 'কি হলো? এসো কাছে এসো।'

'কি হবে কাছে এসে?' স্বপ্নেনদু সময় নিচ্ছিলো।

'তোমাকে জড়িয়ে ধরে সাররাত ঘুমিয়ে থাকবো।'

'আমার ঘুম আসে না।'

'আমারও।'

'তাহলে?'

'তোমার বুকে মুখ রেখে রাতটা কাটিয়ে দেবো।'

স্বপ্নেন্দু টেবিলের দিকে তাকালো। গোলাপটাকে দেখতে তার খুব ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু আত্রেয়ীর সামনে কাপড় সরিয়ে ওটার দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিলো না। ও নিশ্চয়ই লোভী হবে। ওরকম ডাঁটো গোলাপ দেখলে কেউ স্থির থাকতে পারে না। বরং ও ঘুমিয়ে পড়লে, দূর, এখন তো ঘুম চলে গেছে সাধারণ মানুষের চোখ থেকে। স্বপ্নেন্দু এক পা এগিয়ে এলো। একটি নগ্নকঙ্কাল এবার চিৎ হলো। মেয়েদের শরীরের মাংস না থাকলে কিরকম বীভৎস হয়ে যায়। রাস্তাঘাটে যত কঙ্কাল চোখে পড়েছে তাদের দেখলেই এটা

এটা বোঝা যায়। পুরুষদের হাড়ের গঠন মেয়েদের চেয়ে অনেক সুন্দর। কিন্তু হেনার চিবুক? মাংস বা চামড়া না থাকা সত্ত্বেও কিরকম আদুরে। আর আত্রেয়ী? ওর দিকে তাকিয়ে কোনো অনুভূতিই হচ্ছে না।

আত্রেয়ী আবার ডাকলো, এসো না!'

স্বপ্নেন্দু বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, 'শোনো আত্রেয়ী, আমি একটি মেয়েকে ভালবাসি। তার নাম হেনা। আমি তার সঙ্গেই থাকতে চাই।'

'হেনা সে কে?'

'আমার বান্ধবী।'

'তুমি ভালবাস? কত বছর?'

'বছর নয়। তিনদিন।'

'সে কি? তিনদিনে একটা মেয়ের মন বোঝা যায়?

'যায়। যে বুঝতে পারে সে একমুহূর্তেই পারে।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'তোমার অবিশ্বাসে আমি কি করতে পারি।'

'তুমি আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে এসব বলছো।'

'আমি মিথ্যে বলছি না।

আত্রেয়ী ধীরে ধীরে উঠে বসলো, আমি সত্যি কিছু করতে পারছি না। মাত্র তিনদিন দেখে তুমি একটি মেয়ের ওপর নির্ভর করতে চাইছো? সে তোমাকে কি দেবে? তারও তো শরীর নেই। মেয়ে বলে তার কোনো আলাদা অস্তিত্বই নেই? আর আমি তোমাকে চেয়ে পাগলের মতো ছুটে এসেছি এই বিপদে-।' আত্রেয়ীর গলা রুদ্ধ হলো। স্বপ্নেন্দুর মনে হলো ওর মুখটা খুব করুণ দেখাচ্ছে।

'কিন্তু মুখটা খুব করুণ দেখাচ্ছে।

'কিন্তু তুমি এতগুলো বছর আসনি কেনো?'

'আসতে পারি নি। কারণ ও আমাকে ডিভোর্স দিতে না। তাছাড়া আমার ওই এঁটো শরীরটাকে আমি তোমায় দিতে পারতাম না স্বপ্নেন্দু। অনেক কষ্টে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলাম। কলেজ জীবনের ছবিটাকে জোর করে মুছে ফেলেছিলাম। কিন্তু সেদিন লিন্ডস স্ট্রিটে তোমায় দেখে বুঝলাম এতদিন শুধু নিজেকে ঠকিয়েছি। তাই যে মুহূর্তে এই শরীরটা পবিত্র হয়ে গেলো অমনি তোমার কাছে ছুটে এলাম স্বপ্ন।'

স্বপ্নেন্দুর মনে হলো আত্রয়ী সত্যি কথা বলছে। কিন্তু সে এই সত্যিটাকে মেনে নেবে কি করে? সে বললো, 'আত্রেয়ী, আমি তোমার সঙ্গে হেনার আলাপ করিয়ে দেবো।'

'বেশ, কিন্তু আমি তোমার কাছেই থাকবো। এতে কি তোমার হেনা আপত্তি করবে?'

'জানি না। তবে শুনেছি মেয়েরা সতীন পছন্দ করে না।'

'সতীন? ও, তুমি ভুলে যাচ্ছ আমরা কেউ মেয়ে নই।'

'তাহলে তো চুকেই গেলো। তুমি শুয়ে পড়, আমি-।'

'আমার পাশে শুতে তোমার এখন আপত্তি? বন্ধু কি বন্ধুর পাশে শোয় না?'

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হাড়ে হাড়ে কোনো অনুভূতি না হলেও পুরোন অভ্যেস বসতে ইচ্ছে করে। স্বপ্নেন্দু খাটে বসে মাথাটা এলিয়ে দিতেই আত্রেয়ী ওর বুকের কাছে সরে এলো। এসে বললো,

'তোমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ পাচ্ছি।'

স্বপ্নেন্দু আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করলো, 'আচ্ছা আত্রেয়ী এতসব ব্যাপার হয়ে গেলো, মানুষের এমন অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটলো, সবাই হা-হুতাশ করছে কিন্তু তোমার কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি না?'

'না।' আত্রেয়ী হাসলো যেন, 'কারণ আমি আমার শরীরটাকে ঘেন্না করতাম। ওটা আমার শত্রু ছিলো। আর কথা বলো না, আমাকে তোমার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে

দাও।' আত্রেয়ী স্বপ্নেন্দুর বুকের খাঁচায় কান চেপে ধরলো আর ভেতরে সেই শক্ত স্বচ্ছ মোড়কের ভেতরে যে হৃৎপিণ্ড দপদপ করছিলো সে ততক্ষণে অনেক সহজ। হেনাকে সে ভালোবাসে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে আত্রেয়ীকেও ভালোবাসে। শরীরের নির্দিষ্ট গণ্ডী যেহেতু আর চারপাশে নেই তাই কোনো অপরাধবোধও আর কাজ করছে না। স্বপ্নেন্দু আর একবার টেবিলের দিকে তাকালো। ওই কাপড়ের ঢাকনা সরিয়ে জারের আড়ালটা তুললেই তার চোখে ঘুম কিংবা শান্তি নেমে আসতো। কিন্তু ওই ঝুঁকি সে কিছুতেই নিতে পারে না। তাকে সারারাত আত্রেয়ীকে পাহারা দিতে হবে।

ভোরবেলায় স্বপ্নেন্দু বললো, 'চলো, ঘুরে আসি।'

মাঝরাত্রে একটি ঝগড়া হয়েছিলো। স্বপ্নেন্দু পক্ষে সারারাত একনাগাড়ে একই ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা সম্ভব নয় অথচ আত্রেয়ীর কানে হৃৎপিণ্ডের শব্দ পৌঁছানো চাই। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি। স্বপ্নেন্দু বলেছিলো, 'এটা উদ্ভট আবদার। বড্ড বেশি চাওয়া।'

তারপর থেকে অত্রেয়ী চুপচাপ হয়ে গেছে। কোনো কথা বলে নি এতক্ষণ। স্বপ্নেন্দু প্রস্তাব করতেও উত্তর দিলো না। স্বপ্নেন্দুর ইচ্ছে হলো একাই বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু ফুলটাকে এই ঘরে আত্রেয়ীর সঙ্গে 'একা রেখে যাওয়ায়া অসম্ভব। সে কাছে এলো, 'আত্রেয়ী, আমার সঙ্গে কথা বলবে না!'

আত্রেয়ী মুখ ফেরালো, 'আমি যে বড্ড বেশি চাই।'

'একটু কম চাও তাহলেই তো সব মিটে যায়।'

'বেশ, সেইটুকু হলো তুমি।' আত্রেয়ী হাসলো।

এখন সবে আঁধার সরেছে। কিন্তু রাস্তাঘাটে বেশ মানুষ। যেহেতু কারো চোখে ঘুম নেই তাই রাস্তা রাত্রেও ফাঁকা হয় না বের হবার সময় আত্রেয়ীর আর পোশাক পরে নি। স্বপ্নেন্দু আপত্তি জানালে বলেছিলো, 'এখন আর লজ্জা কি? লোকে তো মেয়ে বলে বুঝবে না। বরং কাপড় থাকলে কেড়ে নিতে পারে।'

স্বপ্নেন্দু তবু ইতস্তত করেছিলো, 'কেমন ল্যাংটো ল্যাংটো দেখায়। তাছাড়া হাড়ের গঠন দেখেও ছেলেমেয়ের পার্থক্য বোঝা যায়।' উড়িয়ে দিয়েছিলো আত্রেয়ী, 'ওটা যারা হাড় নিয়ে পড়াশুনা করেছে শুধু তারাই পারে। পাবলিক চিরকাল মুখ্যু।'

এখন রেডিও থেকে বারংবার ঘোষণা করেছে, 'শান্তি বজায় রাখুন। গুজবে কান দেবেন না। ভোর ছ'টায় মুখ্যমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ শুনুন।'

বের হবার সময় পকেট ট্রানজিস্টারটা সঙ্গে নিয়েছিলো। তার পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। গলির মোড়ে আসতেই দুটো লোক এগিয়ে এলো, এই যে দাদা, জামাকাপড় ছাড়ুন।'

'ছাড়বো মানে?' স্বপ্নেন্দুর গলায় বিস্ময়।

'এখন সব পরা চলবে না। পোশাক ব্যবধান সৃষ্টি করে। খুলে ফেলুন।'

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বোঝার কিছু নেই। আপনার সঙ্গে যে দাদা আছেন তিনি তো পোশাক পরেন নি। আপনি ডাঁট মেরে পাঞ্জাবি চাপিয়েছেন। জানেন, কোলকাতার লোকের একটা সুতো পর্যন্ত নেই? এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সবাই এক হতে হবে। পোশাক মানুষ পরতো লজ্জা নিবারণের জন্যে। সেইটি যখন নেই তখন পোশাক খুলে সব মানুষ এক হয়ে যাক।'

স্বপ্নেন্দু আত্রেয়ীর দিকে তাকালো। ওরা ওকে দাদা বললো চমৎকার। এর মধ্যে ভিড় জমে গেছে। সবাই নগ্ন। একজন বললো, 'অত কথায় কাজ কি? জোর করে খুলে নিলেই তো হয়।'

প্রথমজন বললো, 'না না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন শান্তি বজায় রাখতে উনি নিজেই খুলবেন। আমরা ওকে ঘেরাও করে রাখবো যতক্ষণ না খোলেন।' কোনো জোর জবরদস্তি কেউ করবেন না।'

'এই ঘেরাওটা জোর জবরদস্তি নয়?' স্বপ্নেন্দু অসহায় হয়ে পড়েছিলো।

'না। এটা একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাতিয়ার।'

আত্রেয়ী মুখ খুলতে গিয়ে থেমে গেলো। ওর মনে হলো কথা বললেই যে সে পুরুষ নয় তা বুঝে যাবে ওরা। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলো স্বপ্নেন্দু। মুহূর্তেই জামাকাপড় উধাও হয়ে গেলো। সমস্ত শরীরের হাড়ভোরের হাওয়ায় শীতল হলো। এমন কি ট্রানজিস্টারটাও হাতছাড়া হয়ে গেলো। শুধু ঘরের চাবিটা কোনোক্রমে বঁচাতে পারলো স্বপ্নেন্দু। প্রথম লোকটি বললো, ' এতক্ষণে আপনি জনতার সঙ্গ মিলে গেলেন ভাই। যে পোশাক পরবে তাকেই বাধা দেবেন। শান্তি বজায় রাখুন।'

ভীড় ছাড়িয়ে কয়েক পা হেঁটে আত্রেয়ী কথা বললো, তোমাকে তখনই সাবধান করেছিলাম। কিন্তু শুনলে না। যাক, মন খারাপ করো না। তোমার শরীরের কাঠামো সত্যি চমৎকার।'

স্বপ্নেন্দু কাঁধ নাচালো। চায়ের দোকানটায় আজ বেশ ভিড়। সেখানে অবনীদা। কোন্ জন বুঝতে পারলো না স্বপ্নেন্দু। ওরা হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম রাস্তার পাশে চলে আসতেই দেখলো সার সার ট্রাম জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে আছে। চারধারে শুধু থিক থিকে নরকঙ্কাল তারা চিৎকার করছে, এ ওকে আক্রমণ করছে। আত্রেয়ীকে নিয়ে স্বপ্নেন্দু একটা গাড়ি বারান্দার তলায় সরে আসতেই চোখে পড়লো দুজন কঙ্কাল রকে বসে একটা ট্রানজিস্টার চালিয়েছে। তারপরেই ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেলো, 'এখন কলকাতাবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।'

স্বপ্নেন্দু সরে এলো লোক দুটোর কাছে। এবং তখনই সে চিনতে পারলো নিজের ট্রানজিস্টারটিকে। হুবহু সেই দাগটা। এই ব্যাটারাই পোশাক খোলার সময় হাতিয়েছে। ওরা এখন স্বপ্নেন্দুকে চিনতে না পারায় মনোযোগ দিয়ে ট্রানজিস্টার শুনছে। স্বপ্নেন্দুর ইচ্ছে হলো ওটা কেড়ে নেয়। কিন্তু তখনই মুখ্যমন্ত্রী বলতে শুরু করলেন, 'বন্ধুগণ, আমরা এখন গভীর সমস্যাময় সময়ে রয়েছি। পরিবর্তিত পরিস্থিতি উদ্ভুত অভাবনীয় সুযোগগুলো বানচাল করে দেবার জন্যে কিছু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সক্রিয় হয়েছে। তারা এই অতিবৈপ্লবিক পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারছে না। শহরের চারিদিকে অশান্তি এবং গোলযোগ সৃষ্টি করতে চাইছে। এই ষড়যন্ত্র আমরা ধ্বংস করবই। এমন কি এইসব ষড়যন্ত্রকারীরা এখন মৃত্যু কামনা করছে। আপনারা জানেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মৃত্যু হলো একটি জঘন্য ব্যবস্থা যা শুধু দালালরাই কামনা করে। এই অতিবৈপ্লবিক পরিবর্তন আমরা মৃত্যুকে জয় করেছি। এখন সমস্ত মানুষ এক এবং অবিনশ্বর। এই দালালগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করছে যাতে মৃত্যু এস আমাদের নবীন সমাজব্যবস্থাকে বানচাল করে দেয়। আমি একথা জোর গলায় ঘোষণা করতে চাই, সমস্ত ষড়যন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনারা এদের প্রতিরোধ করুন। শহরে শান্তি বজায় রাখুন।'

ভাষণ শেষ হওয়া মাত্রই যার হাতে ট্রানজিস্টার ছিলো সে প্রচণ্ড আক্রোশে ওটাকে ফুটপাথে আছড়ে ফেলতেই সেটা দুমড়ে মুচড়ে গেলো। তারপর চিৎকার করে বললো, 'শালা জ্ঞান দিচ্ছে। কি বললো আর্ধেক কথা আমি বুঝতেই পারি নি। কি ভাষায় যে কথা বলে!'

তার সঙ্গী বললো, 'ওটা ভাঙলি কেনো? বিবিধ ভারতী শোনা যেত।

'একটা গেলো তাতে কি আর একটা ছিনতাই করে নেবো।'

ওরা চলে যাওয়ার পর স্বপ্নেন্দু বললো, 'ওই ট্রানজিস্টারটা আমার ছিলো।'

'সত্যি! তুমি ওদের বললে না কেনো?

'বললে শুনতো? দেখছো না ওরা কিরকম মাস্তান।'

'এই জন্য তোমাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছিলাম।'

'সারাক্ষণ ঘরে বন্দী হয়ে থাকা যায়?'

'বন্দী বলছো কেনো?'

'বন্দী নয় তো কি? আত্রেয়ী অন্যরকম গলায় বললো, 'ভালবাসব।'

চকিতে মুখ ফেরালো স্বপ্নেন্দু। আত্রেয়ী কি পাগল হয়ে গিয়েছে। কোনো কোনো পাগলকে নাকি সাদা চোখে ঠিক ঠাওর করা যায় না। তাদের ব্যবহার ও কথাবার্তার সেটা প্রকাশ পায়। আত্রেয়ী কি সেই ধরনের। নইলে ভালবাসা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা ওর মাথায় নেই?'

সে বললো, 'আমাকে একটু যেতে হবে।'

'কোথায়?

'হেনার বাড়িতে। অনেক দূর। তোমাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'কিন্তু তুমি যাবে কি করে? দেখছো না আজ ট্রামবাস চলছে না।'

'চলে যাবো। তুমি বরং চারপাশ ঘুরে দ্যাখো।'

'বাব্বা। এ যেন বিপ্লবকেও হার মানাচ্ছে। বেশ, তোমাকে তো আমি বাধা দেবো না কিছুতেই। আমি রইলাম। চাবিটা দাও।

'কিসের চাবি?'

'ঘরের।'

'না। ঐ ঘরে তোমাকে একা একা যেতে দিতে পারি না।'

'কেনো?' আত্রেয়ী এত বিস্মিত যে ওর গরা দিয়ে স্বর বের হলো না ভালো করে।

'রাগ করো না। নিশ্চয়ই এমন একটা কারণ আছে যা এই মুহূর্তে তোমাকে বলতে পারছি না। আত্রেয়ী, ভুল বুঝো না। আমি তোমাকে পরে সব খুলে বলবো। তুমি অপেক্ষা করো। আমি ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই চলে আসছি।'

'কিন্তু আমি তোমাকে চিনবো কি করে? আত্রেয়ীর গলার স্বর করুণ। 'তিন ঘণ্টা পরে ঘরের দরজার সামনে অপেক্ষা করো। অন্য জায়গায় থেকো না। আমি ঠিক চলে আসবো।' স্বপ্নেন্দু হাঁটতে শুরু করলো। দূরত্ব কম নয়। কিন্তু স্বপ্নেন্দুর হাঁটতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিলো না। এই কয়দিনে নতুন শরীর বেশ। অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। পায়ে কোনো ব্যথা অনুভূত হচ্ছে না।

আজ রাস্তায় ট্রাম-বাস নেই। মুখ্যমন্ত্রী বারংবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও জনজীবন স্বাভাবিক হয় নি। তার বদলে কাতারে কাতারে নগ্ন কঙ্কাল রাস্তায় আক্ষেপ করছে, উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করছে। তারা কি করবে সেটাই জানে না কিন্তু চুপচাপ ঘরে বসে থাকা বোধ হয় আরও কষ্টকর। অথচ আত্রেয়ী তাকে নিয়ে ঘরেই থাকতে চাইছিলো। আত্রেয়ী বলছে ও তাকে প্রচণ্ড ভালবাসে। ভালবাসলে বোধ হয় ওইভাবে নির্জনে থাকা যায়। কিন্তু সে তো হেনাকে ভালবেসেছে। তবে এতক্ষণে আত্রেয়ীকেও তার খারাপ লাগছে না। কালরাত্রে আত্রেয়ী তাকে সুন্দর সুন্দর গান শুনিয়েছে। সে শুনতে চায় নি কিন্তু আত্রেয়ী গেয়ে গেছে। পুরোন দিনের আবেগ মাখানো গান এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত এই পরিবেশে সেগুলো মোটেই খারাপ লাগে নি তার। ভালবাসলে মানুষ গান গাইতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছে। হেনার সঙ্গে বসে আত্রেয়ীর ব্যাপারটা ফয়সালা করতে হবে। কি করে তা সম্ভব সেটাই জানা নেই।

রাজাবাজারের কাছাকাছি পৌঁছে ভিড়টা নজরে এলো। অন্তত কয়েক শ কঙ্কাল ভিড় করে কিছু দেখছে। স্বপ্নেন্দু ঠেলে ঠুলে এগিয়ে যাচ্ছিলো কিন্তু একজন খেঁকিয়ে উঠলো, 'আঃ মরণ, নজরের মাথা খেয়েছেন নাকি!'

স্বর মেয়েলি, স্বপ্নেন্দু বিনীত ভঙ্গিতে বললো, 'আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

'বুঝবেন কি করে। দেখার জন্যে তো তর সইছে না।'

'আপনি মহিলা তা তো বোঝার উপায় নেই।'

'ঢং। বোঝার উপায় নেই। ভালো করে চেয়ে দেখলেই তো বোঝা যায়।' বলতে বলতে কনুই দিয়ে একটা মৃদু ধাক্কা দিলো সে। স্বপ্নেন্দু খুব তাজ্জব হলো। এতক্ষণ তার ধারণা ছিলো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নারী-পুরুষ একাকার হয়ে গিয়েছে। কাল সারারাত আত্রেয়ীর সঙ্গে থেকেও তাকে নিজের শরীরের থেকে আলাদা বলে মনে হয় নি। সে

খুঁটিয়ে দেখলো তারপর স্থির করলো, মেয়েকঙ্কালের মুখের গঠন ছোট হয়, হাড়গুলো একটু পলকা এবং নরমভাবে মেশানো। সেক্ষেত্রে বালকদের জন্যে খুব বেশি তফাৎ হবার কথা নয়। স্বপ্নেন্দু কথা ঘোরাবার জন্যে, জিজ্ঞাসা করলো, 'কি হচ্ছে এখানে?'

স্ত্রী-কঙ্কালটি বললো, 'ওরা একটা লোককে ধরেছে। তার বিচার হচ্ছে।'

স্বপ্নেন্দু ততক্ষণে দেখতে পেয়েছে। ভিড়ের মাঝখানে চার-পাঁচজন আসামীকে বসিয়ে রেখেছে। এবার জেরা শুরু হয়, 'আপনি মরতে চেয়েছেন, শুধু তাই নয় আপনি আর পাঁচজনকে মরতে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। কেনো?'

লোকটি নির্লিপ্ত গলায় বললো, 'আমার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে মরতে চাওয়ার।'

'মোটেই না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যারা মরতে চায় তারা ষড়যন্ত্রকারী।

তারা এই অতি-বৈপ্লবিক ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে চায়। একবার যদি কেউ মরে যেতে পারে তাহলে সবাই সেই পথ ধরবে। এই অতিবৈপ্লবিক ব্যবস্থায় কারও ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে না।'

'আমি এসব মানি না। আপনারা শাস্তি দেবেন আমাকে? আমি বলি, বরং আমাকে মেরে ফেলুন। এখানে কারও কোনো সুখ নেই। মুখ নেই। সব মুখ এক। কারও কোনো যন্ত্রণা নেই। কারও সামনে কোনো রহস্য নেই। উই হ্যাভ লস্ট আওয়ার আইডেন্টিটি। এইভাবে বেঁচে থাকা যায় না।'

'আপনি দালালদের মতো কথা বলছেন।'

'জানি না। তবে যে দেশে ফুল নেই, জল নেই, একটুও সবুজ নেই সেই দেশে আমি অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চাই না।'

লোকটা মাথা নাড়লো। এমন কি একটা মেয়ে পর্যন্ত নেই।'

'ওমেন'স লিব কথাটা শুনেছেন? মেয়েরা এতকাল পুরুষদের সমান হবার জন্যে আন্দোলন করছিলো আর আপনাদের মতো পুরুষেরা সেই আন্দোলন দাবিয়ে রেখেছিলেন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মেয়েদের সেই আশা পূর্ণ হয়েছে।'

স্বপ্নেন্দু শুনলো স্ত্রী কঙ্কালটি চাপা স্বরে বললো, 'ঝাঁটা মার। গতর গেলে মেয়েমানুষের আর কি থাকলো!'

'যা হোক আপনি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করেছেন। এই জন্যে আপনাকে শাস্তি দিচ্ছি।'

'চমৎকার।' মেরে ফেলুন।

'না ওটা করলে মুখ্যমন্ত্রীর হাত নরম হবে।'

লোকটি হাসলো, 'আপনার হাত পায়ের প্রতি জোড়ে ইলেকট্রিক করাত চালাবো যাতে শুধু আপনার বুকের খাঁচাটা ফুটপাতে পড়ে থাকে। হৃৎপিণ্ড তো ভাঙা যাবে না। আপনি চিরকাল ওই অবস্থায় পড়ে থাকবেন। হাঁটাচলা করার স্বাধীনতা থাকবে না।'

স্বপ্নেন্দু ভিড় থেকে বেরিয়ে এলো। লোকটা নিশ্চয়ই গর্দভ। নইলে মৃত্যুর জন্যে এঁড়ে তর্ক করে। হঠাৎ তার খেয়াল হলো কেউ সঙ্গে আসছে। স্ত্রী কঙ্কালটিকে সে চিনতে পারলো, 'আপনি? কোথায় যাচ্ছেন?'

'যাবার তো জায়গা নেই। ওসব দৃশ্য সহ্য করতে পারি না আমি।

আপনি বেরিয়ে এলেন বলে আমিও চলে এলাম।'

'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'বাড়ি নেই। ঘর ছিলো। ভাসতে ভাসতে হাড়কাটায় ঠেকেছিলাম। এখন আমাকে বেবশ্যে বলে চেনা যায় না; না?' স্ত্রী কঙ্কালটি খিলখিলিয়ে হাসলো।

স্বপ্নেন্দু আড়ষ্ট হলো। কঙ্কালটি এক সময় বেশ্যাবৃত্তি করতো। অথচ এখন ওকে দেখলে নিজেদের মতোই লাগছে। সে বললো, 'আমি এবার বাঁ দিকে যাবো। আপনি যেখানে ইচ্ছে যান।'

'তাতো বলবেই। এখন আমি বেকার। কিন্তু তখন ধাক্কা দিলে কেনো?'

'আমি তো বললাম আপনাকে লক্ষ্য করি নি।'

'ইল্লি আর কি! ধান্দাবাজ লোকেরাই ধাক্কা দেয়।

স্বপ্নেন্দুর হঠাৎ ভয় এলো বুকে। এই স্ত্রী কঙ্কালটির উদ্দেশ্য সে বুঝতে পারছিলো না। সে দৌড়ে পাঁচজন কঙ্কালের সঙ্গে মিশে হাঁটতে লাগলো। স্ত্রী কঙ্কালটি ছুটে এলো সেখানে। স্বপ্নেন্দু বুঝতে পারলো বেচারা ধাঁধায় পড়েছে। ছয়জনের মধ্যে কোন্ জন তা বুঝে উঠছে না। তারপর একজনের হাত চেপে ধরে স্ত্রী কঙ্কালটি চিৎকার করে উঠলো, 'এই শালা, ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে আসা হয়েছে না?'

সেই লোকটি অবাক ও বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠলো, 'আরে, আমার হাত ধরেছিস কেনো, ফোট্।' আর একজন হেসে বললো, 'ইয়ে শালী রাণ্ডী থি।'

স্ত্রী কঙ্কালটি বোকার মতো দাঁড়িয়ে পড়লে স্বপ্নেন্দু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। দ্রুত পা চালাতে লাগলো সে। লস্ট আইডেন্টিটি। তা না হলে সে রক্ষা পেতো না ওই জাঁহাবাজ স্ত্রী কঙ্কালটি হাত থেকে। পরিচয় হারিয়ে যাওয়ায় একটা বড়ো উপকার হলো। এখন যে কেউ যে কোনো ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে।

এখন শরীর খুব দ্রুত হাঁটতে পারছে। তবু সময় কম লাগলো না-রাস্তায় যেতে যেতে অনেক দৃশ্য দেখেছে স্বপ্নেন্দু। যে যেখানে ইচ্ছে আগুন ধরাচ্ছে। তাতে কারও কোনো আপত্তি নেই যেন। দমকলের গাড়িই নেই কারণ জল অদৃশ্য। এমনকি যার ঘর পুড়ছে তারও যেন সম্পত্তির ওপর মায়া চলে গেছে। সমস্ত মানুষ এখন উন্মাদ। হেনাদের বাড়ির সামনে এসে দেখলো প্রচণ্ড ভিড় জমেছে। অনুমানে বুঝলো সেখানেও কোনো বিচার পর্ব চলছে। কৌতূহল হলেও সেদিকে আর পা বাড়ালো না সে। একবারে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

দরজা খোলা। ঘরের আসবাবগুলো নেই। সব খাঁ খাঁ করছে। স্বপ্নেন্দু ডাকলো, 'হেনা।'

ভেতর থেকে কোনো সাড়া এলো না। স্বপ্নেন্দু এগোলো। কোনো ঘরে কেউ নেই। হতভম্ব হয়ে গেলো সে। হেনারা গেলো কোথায়। নিজের অজান্তেই সে চিৎকার করলো, 'হেনা।'

স্বপ্নেন্দু বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখলো তিনজন একজনকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে আসছে। যাকে টানছে তার স্বর চিনতে পারলো স্বপ্নেন্দু। সে ছুটে গেলো সামনে, 'হেনা, হেনা তোমার কি হয়েছে?'

যারা টানছিলো, তারা দাঁড়িয়ে পড়লো যাকে টানছিলো সে সোজা হলো। স্বপ্নেন্দু আবার বললো, 'হেনা, তোমার কি হয়েছে? আমি স্বপ্নেন্দু।'

সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়লো হেনা। মাটিতে উবু হয়ে বসে কান্না জড়ানো স্বরে বললো, 'ওরা আমার মাকে ধরে নিয়ে গেলো।'

'কেনো?'

যারা হেনাকে এনেছিলো তাদের একজন বললো, 'ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

'মাথায় ঘিলু নেই খারাপ হবে কি করে?'

'তাহলে হৃৎপিণ্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে। জানলা দিয়ে নিচে ঝাঁপ দিয়েছিলেন মরার জন্যে। হাত পা ভেঙেছে, মরেন নি। সেই অবস্থায় পাগলের মতো মরতে চাইছিলেন। সেই অবস্থায় বিচার করে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো পাতাল-কূপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এক বছরের জন্যে বন্দী করে রাখতে। আপনি যখন এঁর পরিচিত এঁকে সামলান। আমরা চলি।' লোকগুলো চলে গেলো।

ধাক্কাটা সামলে স্বপ্নেন্দু হেনার মাথায় হাত দিলো, 'হেনা, শান্ত হও।'

'ওরা মাকে ধরে নিয়ে গেছে। তুমি কিছু করবে না? কান্না আছে কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় জলের তো দেখা পাওয়া যাবে না।

'এখনই তো কিছু করা যাবে না। তুমি ওকে বাধা দাওনি কেনো?'

'দিয়েছিলাম। শোনেন নি আমার কথা। উল্টে বললো, তো তো একটা প্রেমিক আছে আমি কি নিয়ে থাকবো। ভাবতে পার আমার মা আমাকে ওই কথা বললো।'

'কি পরিবর্তন। এখন আমি কি করবো!'

হেনাকে তুলে দাঁড় করালো স্বপ্নেন্দু, 'আমি আছি, তোমার ভয় নেই হেনা।'

'মাকে কি আমি ফিরে পাবো না?'

'পাবে। এখন তো কেউ মরে না। নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো আমি। আমার ওপর ভরসা রাখো হেনা। আমি তোমাকে গ্রহণ করতে এত দূরে চলে এসেছি।'

'সত্যি?' হেনার স্বরে উত্তাপ।

'সত্যি?' তুমি আমার সঙ্গে চলো।'

'আমাকে কোনোদিন কষ্ট দেবে না?'

'না।'

'কিন্তু কিভাবে থাকবো। এখন তো আমাদের বিয়ে হবে না।'

'আমরা সার্টিফিকেট যোগাড় করবো সরকার থেকে। আমি কথা বলেছি।'

'কিন্তু আমাকে নিয়ে তুমি কি করবে?'

'আমি ভালবাসবো। আমি তোমাকে সুখী করবো।'

'সত্যি সুখে রাখবে আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এখন তো কলকাতা থেকে সুখ উধাও হয়ে গিয়েছে। তুমি কি করে আমাকে সুখী করবে? তোমার কাছে কি সুখের গোপন মন্ত্র আছে?'

'কি সুখ তুমি চাও হেনা?'

'জানি না। একটা অসহায় মেয়ে কি সুখ চাইতে পারে।'

'আমি তার থেকে অনেক বেশি সুখ দেবো তোমাকে। তুমি এসো।'

'কি সে সুখ?'

'এখন বলবো না। তুমি আমার ঘরে চলো। তারপর তোমাকে দেখাবো।'

হেনা বোধহয় অবিশ্বাস করলো কিন্তু অবাধ্য হলো না। ধীরে ধীরে সম্মত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। কয়েক পা হাঁটবার পর স্বপ্নেন্দুর খেয়াল হলো, তোমাদের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। বন্ধ করবে না?'

'কি হবে বন্ধ করে? ওখানে যা ছিলো সব লুঠ হয়ে গেছে মা চলে যাওয়ার পরে। তোমার সঙ্গে গেলে আমি আর এখানে ফিরে আসছি না।' স্বপ্নেন্দু লক্ষ্য করছিলো হেনার শরীরে পোশাক নেই। অথচ হেনা এ ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলো। নিশ্চয়ই উত্তেজনায় ওর এ বিষয়ে আর লক্ষ্য ছিলো না। সে হেনার দিকে তাকালো হাড়ের গঠনেও যেন একটা ছন্দ ছড়ানো আছে।

হেনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিলো। সারাটা পথ সে কেবল ঘুরে ফিরে মায়ের কথা বলেছে। স্বপ্নেন্দু তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, পরিচিত কর্তাব্যক্তিকে ধরে সে নিশ্চয়ই হেনার মাকে উদ্ধার করবে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা রাজাবাজারের কাছে পৌঁছে একটা ছোট্ট ভিড় দেখলো। ফুটপাতে হাতপা-মুণ্ডহীন অবস্থায় একটা বুকের খাঁচা পড়ে আছে। অথচ সেই খাঁচায় আটকে থাকা নিরেট আবরণের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ড সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে, 'মেরে ফেলো, মেরে ফেলো...।'

হেনা চমকে উঠলো, 'কি হয়েছে ওর?'

স্বপ্নেন্দু ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলো। এর মধ্যেই শাস্তি দেয়া হয়ে গেছে। একে প্রকাশ্যে রাখা হয়েছে যাতে সাধারণ নাগরিকরা মৃত্যুর কথা বলতে ভয় পায়। কিন্তু কি লাভ হচ্ছে ওতে। শাস্তি পাওয়ার পরও তো লোকটা সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এসব কথা হেনাকে বলা যায় না। ঘটনাটা জানালে হেনা চট করে মায়ের অবস্থা ভাববে।

ভদ্রমহিলা যদি সচেতন না হন তাহলে তাঁরও এই পরিণতি ঘটবে। সে উদাস গলায় বললো, 'হয়তো পড়েটড়ে হাড়গোড় ভেঙেছে। তুমি আমার হাত ধরো।'

হেনা যে একটু কাঁপলো, 'যাঃ, খোলা রাস্তায় হাত ধরে হাঁটবো কি!'

'তাতে কি হয়েছে? এখানে কেউ বুঝতে পারবে নাকি আমরা ছেলেমেয়ে ছিলাম।'

'ছিলাম।' ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললো হেনা।

'হাত না ধরলে ভিড়ের মধ্যে নিজেদের গুলিয়ে ফেলতে পারি।'

এবার হেনা হাত বাড়ালো। শীতল না উষ্ণ বোঝা গেলো না কারণ স্বপ্নেন্দু আবিষ্কার করলো তার নিজের হাতের অনুভূতি হারিয়ে গেছে।

সে তবু বললো, 'তোমার হাত খুব নরম ছিলো, না?'

সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে উঠলো হেনা। ত্রস্ত স্বপ্নেন্দু জিজ্ঞাসা করলো, 'কি হলো তোমার?'

'কেন মনে করিয়ে দাও ওসব?'

'সরি। আসলে, তুমি এখনও খুব নরম। তোমার মনটা এত নরম-।'

চারধারে অশান্তি বাড়ছে। ওরা থেমে থেকে এগোচ্ছিলো। রাস্তায় সে যাকে পারছে আঘাত করছে। হাড়ে হাড়ে ঠকাঠক শব্দ হচ্ছে। একটা জায়গায় বিচার চলছিলো বোধ হয়। হঠাৎ জনতা ক্ষেপে গিয়ে বিচারকদের ধাওয়া করলো। বিচারকরা পালাতে পালাতে চিৎকার করছিলো শান্তি বজায় রাখুন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন... । কিন্তু কে শোনে কার কথা।

বড় রাস্তা তবু নিরাপদ। জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে কোনোরকমে এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু গলিতে ঢোকা বিপদজ্জনক। সেখানে আগুন জ্বলছে। জল নেই দমকল নেই অতএব আগুনের পোয়াবারো। চোখের সামনে বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে এটা দেখার মধ্যে বেশ মজা আছে বোধহয়। মানুষগুলো এতকাল কোনো উত্তেজনা পাচ্ছিলো না। এখন আগুনের খেলা দেখে বেশ আনন্দ পাচ্ছে। কেউ কেউ আবার সেই আগুনে স্নান করার মতো পাক খেয়ে আসছে। হেনা স্বপ্নেন্দুর হাত ধরে বললো, 'কলকাতায় যখন আর কিছুই পোড়াবার থাকবে না তখন কি করবে ওরা? কিসে উত্তেজনা পাবে?'

'জানি না।'

হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়াতে হেনা প্রশ্ন করলো, 'তুমি তখন আমাকে কি শেখাবে বলেছিলেন?'

'স্বপ্নেন্দু হাসলো, 'অধৈর্য হচ্ছো কেন? আমার ওখানে চলো তারপর দেখবে।'

হেনা বললো, 'ভাবতে কেমন লাগে, না? তুমি ডাকলে আর আমি চলে এলাম। একবারও ভবিষ্যতের কথা ভাবলাম না।'

'তোমার ভবিষ্যৎ তো আমার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।'

'কি জানি।'

আর এই সময় আত্রেয়ীর কথা মনে পড়লো স্বপ্নেন্দুর। ও যদি চলে না যায় তাহলে বাড়িতে যাওয়া মাত্র দেখা হবে। ওর কথা শুনলে হেনা কি ভাববে? তাকে যদি বিশ্বাঘাতক মনে করে চলে আসে?

স্বপ্নেন্দু ভেবে পাচ্ছিলো না কি করবে! বলি বলি করেও বলতে পারলো না সে। তার মনে হলো এর চেয়ে হেনাদের বাড়িতেই থেকে গেলে হতো। আত্রেয়ী তার খোঁজ পেতো না। কিন্তু যখন মনে হয়েছিলো হেনাকে নিজের কাছে নিয়ে যাবে, হেনার কাছে থাকার কথা খেয়ালে আসে নি। স্বপ্নেন্দুর হঠাৎ মনে হলো সে আত্রেয়ীকে এত ভয় পাচ্ছে কেনো? আত্রেয়ী তাকে ভালবাসে এইটুকু কি হেনা সহ্য করবে না? কোনো পুরুষ যদি তাকে ভালবাসতো তাহলে হেনা কি করতো! এখন তো আত্রেয়ী আর মেয়ে নয়। সে স্থির করলো যা হবার হবে। যেমন করেই হোক হেনাকে রাজী করাবে তার সঙ্গে থাকতে।

শেষ পর্যন্ত পাড়ায় পৌঁছালো ওরা। হেনা বললো, 'এদিকটা বেশি ঘিঞ্জি না?'

উত্তর কলকাতায় থাকার জন্যে এই প্রথম খারাপ লাগলো স্বপ্নেন্দুর। তবু বললো, 'এসব তো বনেদী পাড়া। প্ল্যান করে তৈরি হয় নি তখন। তবে আমার ঘরে হাওয়া

আসে।' একমাত্র তারাই হাত ধরাধরি করে যাচ্ছে। আর বাকি মানুষ পাগলের মতো চিৎকার করছে। গলিতে ঢুকেই ধোঁয়া দেখতে পেলো ওরা। স্বপ্নেন্দুর ভয় হচ্ছিলো তাদের বাড়ি ছাই হয়ে গেছে কিনা। বাড়ির কথা মনে হতেই চাবির কথা খেয়ালে এলো। চাবিটা কোথায়। হাতে নেই তো সে স্তব্ধ হয়ে গেলো। ওরকম দামী গা-তালা চাবী ছাড়া খোলা মুস্কিল। কখন যে হাত থেকে টুক করে পড়ে গেছে সেটা তার খেয়ালেই নেই। এখন একটা তালাওয়ালা যদি না পাওয়া যায় তাহলে দরজা ভাঙতে হবে। সে চাপা গলায় বললো, 'সর্বনাশ।'

হেনা চমকে উঠলো, 'কি হয়েছে? তোমার বাড়িতে আগুন দিয়েছে নাকি?'

'না। কিন্তু আমি ঘরের চাবি হারিয়ে ফেলেছি।'

'সেকি?'

'হ্যাঁ। খুব শক্ত তালা। এখন দরজা খুলবো কি করে?'

হেনা এবার হেসে উঠলো, 'তোমার বুকে হাত দিয়ে দ্যাখো? 'বুকে?'

স্বপ্নেন্দু অবাক হয়ে নিজের হৃৎপিণ্ডের দিকে তাকালো। এবং তখনই সে তার চাবিটাকে পেলো। হৃৎপিণ্ডের চারদিকের শক্ত স্বচ্ছ মোড়কের গায়ে চাবিটা আটকে আছে। ওটা ওখানে কি করে গেলো? স্বপ্নেন্দু হাত বাড়িয়ে চাবিটাকে টানতে গিয়ে টের পেলো। মোড়কটিতে চুম্বক কাজ করছে। যা কিছু শক্ত তাই বোধহয় এই হৃৎপিণ্ড টেনে নেয়। অদ্ভুত ব্যাপার।

কয়েক পা এগিয়ে অবনীদার চায়ের দোকানটার দিকে নজর যেতেই স্তব্ধ হয়ে গেলো স্বপ্নেন্দু। ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে সেখানে। একটা লোক সমানে উবু হয়ে বসে সেদিকে তাকিয়ে। দোকানটা এখন প্রায় ছাই। স্বপ্নেন্দু মনে হলো লোকটা নিশ্চয়ই অবনীদা। খুব কষ্ট না পেলে কোনো মানুষ ওইভাবে বসে থাকতে পারে না। আর এই দোকান ছাই হওয়ায় সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাবেন একমাত্র অবনীদা।

সে ডাকলো, 'অবনীদা, না?'

'হুঁ। তুমি কে ভাই?' অবনীদার ভঙ্গির পরিবর্তন হলো না।

'আমি স্বপ্নেন্দু।'

'দ্যাখো, ওরা কিছু না পেয়ে দোকনাটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেলো।

'কোনো? আপনি কি করেছিলেন?'

'কিছু না। ওদের তো কোনো কাজ করার নেই অথচ কিছু একটা করতে হবে। এই দোকানটা চোখে পড়তেই পুড়িয়ে দিলো খুব হই হই করলো যতক্ষণ আগুন জ্বলছিলো। তারপর চলে গেলো। ওই দ্যাখো ন্যাড়ার বাপ এখনও পড়ে আছেন ফুটপাতে।'

স্বপ্নেন্দু চোখ ফেরালো। সেই বৃদ্ধ যিনি দড়িতে ঝুলছিলেন, আগুনের ছ্যাঁকা খেয়েছিলেন তিনি এখন হাত পা-হীন অবস্থায় ফুটপাতে পড়ে আছেন। কোনো কথা বলছেন না কিন্তু তার শরীর নড়ায় বোঝা যাচ্ছে মৃত্যু ধারে আছে আসে নি।

স্বপ্নেন্দু হেনার হাত ধরে এগিয়ে গেলো বাড়ির দিকে। হেনা জিজ্ঞাসা করলো, 'ওর কি হয়েছে?'

'পড়ে টড়ে গেছে বোধহয়।' নিরীহ ভঙ্গিতে বললো স্বপ্নেন্দু।

'মিথ্যে কথা। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। ঠিক আছে, আমিই জিজ্ঞাসা করছি।' ফুটপাথে উঠে সামান্য ঝুঁকে হেনা জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনার এরকম হলো কেনো?'

বৃদ্ধের মুণ্ডু হেনার দিকে ফিরলো, 'বলবো না।'

'কেনো বলবেন না?'

'আমার ইচ্ছে তাই বলবো না। আবার বলে মুণ্ডটাকে হারাই আর কি?'

হেনা একটু হকচকিয়ে সরে এলো। স্বপ্নেন্দু বললো, 'তেমন কিছু না হলে কি বলতো না?'

হেনার কিন্তু তখনও খুঁত খুঁতনি যাচ্ছিলো না।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই স্বপ্নেন্দু থমকে দাঁড়ালো। একটা কঙ্কাল মুখ ঝুঁকিয়ে বসে আছে দরজার গোড়ায়। ওদের দেখেই সে উঠে দাঁড়ালো 'স্বপ্নেন্দু?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি হেনা?'

হেনা এবার বিস্মিত। স্বপ্নেন্দুর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলো,

'ইনি কে?'

'আমি?' হি হি করে হাসলো আত্রেয়ী, 'আমি কেউ না! পথের ভিখিরি।

দূর ছাই, আমি শুধু ভুলে যাই, এখন তো একটা ভিখিরিও নেই।'

স্বপ্নেন্দু বললো, 'হেনা, এর নাম আত্রেয়ী। আমরা একসঙ্গে পড়তাম।

তারপর ওর বিয়ে হয়ে যায়, যোগাযোগও ছিলো না। কাল এই বিপর্যয়ে আমার এখানে এসেছে।'

'তবু বলতে পারলে না আমরা বন্ধু।' চিৎকার করে উঠলো আত্রেয়ী।

'ঠিক আছে, বন্ধু।'

হেনা অবাক হয়ে বললো, তোমরা কাল একসঙ্গে ছিলে? তুমি আমাকে একথা বলো নি কেনো স্বপ্নেন্দু?'

সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো আত্রেয়ী, 'এই বোকা, তুমি ওকে ভালবাস?'

'জানি না।'

'কিন্তু ও তোমাকে ভালবাসে। তুমি তো মেয়ে ছিলে আমি ও আমরা কি চাইতাম? ছেলেদের সমান হবো, তাই না? আজ তো ছেলেমেয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তাহলে শুধু শুধু মেয়েলিপনা করবো কেনো?'

'আপনি আমার হাত ছাড়ুন'

'না, ছাড়বো কেনো? তোমাকে আমার বন্ধু হতে হবে।'

'খামোকা বন্ধু হতে যাবো কেনো?'

'কারণ তোমাকে স্বপ্নেন্দু ভালবাসে।'

'তার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?'

আত্রেয়ী বললো, 'কারণ আমি স্বপ্নেন্দুকে ভালবাসি।'

চকিতে হেনা জিজ্ঞাসা করলো, 'ও আপনাকে ভালবাসে?'

'না। ও তোমাকে ভালবাসে তাই।'

'তাহলে?'

'কি তাহলে? এখন তো আর কিছু পাওয়ার আশা নেই। আমাদের শরীর নেই, নারীত্ব নেই। শুধু হৃৎপিণ্ড আছে যা দিয়ে আমরা ভালবাসতে পারি। এসো আমরা বন্ধুর মতো থাকি।'

'না।'

'কেনো?'

আমি আপনাকে সহ্য করতে পারছি না।'

'আমি পারছি।'

'আপনি পাগল।'

ঠিক এই সময়ে সিঁড়ির নিচে একটি কঙ্কাল এসে দাঁড়ালো, 'স্বপ্নেন্দু আছো?'

স্বপ্নেন্দু বললো, 'কে আপনি?'

'আমি অবনীদা।'

'ও, কি ব্যাপার?'

'আমাকে একটু জায়গা দেবে স্বপ্নেন্দু, আজকের রাতটার জন্যে। আমার খুব ভয় করছে। ওরা নাকি আবার আসবে।'

'কারা?'

'যারা পাগল হয়ে এসব করছে?'

''আসুন।'

অবনীদা উঠে এলেন। তারপর বললেন, 'তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে থেকো না। নিচের দরজা খোলা। ওরা দেখলে এখানেও উঠে আসতে পারে।'

স্বপ্নেন্দু দ্রুত নেমে নিচের দরজা বন্ধ করে এলো। তারপরে ঘরের চাবি খুলে দিতেই সবাই ভেতরে ঢুকলো। স্বপ্নেন্দু বললো, 'দুটো ঘরে ভাগ করে থাকো। আত্রেয়ী, আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে যাবে। তোমাকে বারংবার বলেছি যে আমি হেনাকে ভালবাসি।'

'কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালবাসি।'

'উঃ, আমি পাগল হয়ে যাবো।' স্বপ্নেন্দু চেঁচিয়ে উঠলো।

আত্রেয়ী হেসে উঠলো খিলখিল করে। তারপর এগিয়ে গেলো হেনার কাছে, 'এখন তো কোনো উপায় নেই, নইলে তোমার শরীরের গন্ধ নিতাম।'

'মানে?'

'কি করে ওকে মজালে ভাই?'

হেনা বিরক্ত হলো, 'ভদ্রভাবে কথা বলুন।'

আবার হাসলো আত্রেয়ী। তারপর অবনীদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনাকে আমি চিনি না। কিন্তু বলুন তো আমি কি অন্যায় করেছি?'

অবনীদা মাথা নাড়লেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এই সময় বাইরের হল্লা আরও বেড়ে গেলো। শুধু হাড়ে হাড়ে শব্দ হচ্ছে। সমস্ত কলকাতা শহরে যেন হাড়ের বাজনা বাজছে।

স্বপ্নেন্দু বললো, 'আমার বুকটা কেমন করছে হেনা, আমার বুকের ভেতরটা দুলছে।'

হেনা এবার এগিয়ে এলো তার সামনে, 'কিন্তু আমার সুখ? কি সুখ দেবে তুমি?'

'সুখ?'

'হ্যাঁ। মিথ্যে বলার চেষ্টা করো না।'

'নিশ্চয়ই। তুমি মিথ্যেবাদী। আমাকে ভালবাসার বুলি শুনিয়ে ভাঁওতা দিয়েছো। ওই পাগলের সঙ্গে রাত কাটিয়ে গেছো আমার কাছে। কি নেবে তুমি আমার কাছ থেকে? কি লোভ তোমার?'

'হেনা!' চিৎকার করে উঠলো স্বপ্নেন্দু।

'চেঁচিও না। আমি আর কিছুতেই ভুলছি না।' হেনা অবনীদার দিকে তাকালো, 'এই যে, আপনি শুনুন, এই লোকটা বলেছিলো ওর সঙ্গে এলে আমাকে নাকি সুখ দেবে। বলুন ওকে সেই সুখ দিতে!'

অবনীদা বললেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এই সময় আত্রেয়ী এগিয়ে এলো, 'সুখ চাইলেই কি পাওয়া যায়? কাল রাত্রে আমি সুখ পেয়েছিলাম। সুখ পেতে জানতে হয়।

নেহা চিৎকার করে উঠলো,

আমি ওকে সুখ দিয়েছো?'

'আমি জানি না, বিশ্বাস করো, আমি তোমাকেই ভালবাসি।'

'মিথ্যে কথা। কি প্রমাণ আছে এর?'

'আছে, প্রমাণ আছে।'

'বিশ্বাস করি না। প্রমাণ দাও।'

'আমি তোমার হৃদয় শান্ত করে দিতে পারি।'

'কিভাবে।'

'তোমার একটু উত্তেজনা থাকবে না হৃদয়ে।'

এবার অবনীদা বললেন, 'তুমি কি ম্যাজিক জানো স্বপ্নেন্দু?'

'তার চেয়ে বেশি। আমার কাছে এমন একটা জিনিস আছে যা কোলকাতার মানুষ চিন্তাও করতে পারবে না। বসুন আপনারা ওখানে।' স্বপ্নেন্দুর স্বরে এমন কিছু ছিলো যে বাধ্য হলো ওরা খাটে বসতে। স্বপ্নেন্দু এগিয়ে গেলো টেবিলের কাছে। তারপর সন্তর্পণে চাদরটা সরালো। আবছা লালচে আভা দেখা গেলো। হেনা জিজ্ঞাসা করলো,

'কি ওটা?'

আত্রেয়ী শিশুর গলায় বললো, 'বাঃ সুন্দর।'

এবার কাঁচের বড়ো জারটা। সেটা সরাতেই কাঁচের বাটির তলায় লাল টকটকে ডাঁটো গোলাপটাকে দেখতে পেলো সবাই। উদ্ধত ভঙ্গিতে যেন তাকিয়ে রয়েছে। সেই জলের ফোঁটাটাও তেমন টলটলে।

স্বপ্নেন্দু বললো, 'এটা রক্তগোলাপ। কোলকাতায় কোথাও আর ফুল নেই। শুধু আমার কাছে, আমার কাছে ও বেঁচে আছে। তোমরা ওর দিকে একটু তাকাও, দেখবে হৃৎপিণ্ড শান্ত হয়ে যাবে। আরাম পাবে।'

ওরা তিনজন মুগ্ধ চোখে ফুলের দিকে তাকাচ্ছিলো। প্রত্যেকের উত্তেজনা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিলো। হেনা অস্ফুটে বললো, 'আঃ কি আরাম। স্বপ্নেন্দু, আমি তোমার কাছ থেকে সত্যিকারের সুখ পেলাম। আর একটুও কষ্ট হচ্ছে না আমার। তুমি কি ভালো!'

অবনীদা বললেন, 'স্বপ্নেন্দু, আমি কৃতজ্ঞ। আমার হৃৎপিণ্ড জুড়িয়ে গেলো।'

শুধু আত্রেয়ী কোনো কথা বললো না।

স্বপ্নেন্দু ডাকলো, 'আত্রেয়ী!'

আত্রেয়ী দুহাতে মুখ ঢাকলো 'আমি চাই না। সুখ চাই না। সারাজীবনে যে একটুও সুখ পেলো না তার আর সুখের দরকার নেই। ঢেকে ফেলো ওটাকে।'

হেনা বললো, 'না।' তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে এলো, 'আমি তোমাকে ভালবাসি স্বপ্নেন্দু। তুমি আমার ওপর রাগ করো না।'

এই প্রথম শব্দটা শুনে স্বপ্নেন্দু আপ্লুত হলো। তার হাত ধরলো আত্রেয়ী,

'তুমি ওই ফুলটা আমাকে দাও।'

'কেনো?'

'ওটা আমার।'

'না। এই ফুল তুমি চেয়ো না।'

'কেনো? আমাকে তুমি দিতে পারবে না?'

এবার আত্রেয়ী উঠে এলো, 'আমি কি দোষ করলাম? আমাকে দাও ফুলটা।'

সে হাত বাড়ালে হেনা বাধা দিলো, 'না। আমি নেবো। ও আমাকে দেবে। আমি স্বপ্নেন্দুকে ভালবাসি।'

'না, আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসি ওকে। হেনাকে সরিয়ে দিতে চাইলো আত্রেয়ী। তারপরেই ঘরে দৃশ্যটা অভিনীত হলো। একদা রমণী দুটো শরীর পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আক্রোশে। এতক্ষণ বাইরের রাস্তায় যে হাড়ের শব্দ হচ্ছিলো সেটা এখন চলে এলো ঘরের ভেতরে। স্বপ্নেন্দু পাথরের মতো দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিলো। তার যেন কিছুই করার নেই। সমস্ত আত্মসম্মান চক্ষু লজ্জা খুইয়ে দুটো মানুষ নিজেদের অহঙ্কার বাঁচাতে একটা ফুলের জন্যে লড়ছে।

এই সময় অবনীদা বাধা দিলেন। জোর করে ওদের ছাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ছি ছি, আপনারা পাগল হয়ে গেলেন নাকি!'

দুজনেই একসঙ্গে চিৎকার করলো, 'আমার ফুলটা চাই।'

অবনীদা বললেন, বেশ, স্বপ্নেন্দু যাকে দেবে সেই ফুলটা পাবে।

যে পাবে না তাকে এটা মেনে নিতে হবে।'

কিন্তু স্বপ্নেন্দু মাথা নাড়লো, 'না। ওই ফুলে আমি হাত দেবো না।'

'কেনো?' তিনটে গলা একসঙ্গে প্রশ্ন করলো।

'বিশ্বাস করো, ওই ঢাকনার তলা থেকে বের করে আনলে ফুলটা আর বাঁচবে না। একে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে ঢাকনা সরানো চলবে না।'

'বিশ্বাস করি না।' আত্রেয়ী বললো।

'তুমি প্রমাণ করো কাকে তুমি ভালবাস।' হেনা দাবী জানালো। স্বপ্নেন্দু অসহায় বোধ করলো। তারপর মরীয়া হলো। কাঁপা হাতে সে কাঁচের বাটিটাকে স্পর্শ করলো। তারপর এক ঝটকায় সেটাকে সরিয়ে ফুলটাকে স্পর্শ করলো। তারপর এক ঝটকায় সেটাকে সরিয়ে ফুলটাকে হৃৎপিণ্ডে চেপে ধরতেই স্বপ্নেন্দুর সমস্ত শরীর থরথর করে উঠলো। তারপর কঙ্কালের ওপর ধীরে ধীরে মাংস চামড়া ধমনী দেখা দিলো। শেষ পর্যন্ত একটি পূর্ণ মানুষের চেহারায় ফিরে গিয়ে স্বপ্নেন্দু উচ্চারণ করলো, 'মাগো!' এবং তারপর একটি সম্পূর্ণ মানুষের শরীর ক্রমশ নত হলো, নত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লো। ওরা তিনজন ছুটে এলো সেই শরীরের পাশে। বুকের ওপর ফুলটা শুকিয়ে ছাই হয়ে আছে। স্বপ্নেন্দুর মুখে তৃপ্তির ছাপ, শরীরে প্রাণ নেই। ওরা তিনজন পাগলের মতো কিছুক্ষণ স্বপ্নেন্দুকে ডাকাডাকি করলো। তারপর অবনীদা ছুটে গেলেন জানলায়, শেষ পর্যন্ত দরজায় আত্রেয়ী এবং হেনার সামনে একটি রক্তি মাংসের পূর্ণ নগ্ন মানুষ। ওরা দুজন পাগলের মতো সেই মানুষকে স্পর্শ করছিলো। একটি মানুষ, তা চোখ নাক মুখ গলা বুক পেট নিয়ে যে সম্পূর্ণ তাকে দুহাতে আস্বাদ করতে চাইছিলো একদা-রমণীরা।

অবনীদা ততক্ষণে ছুটে গিয়েছেন রাস্তায়। পাগলের মতো চিৎকার করে বলেছেন, 'শুনুন আপনারা। একটা মানুষ মরে গেছে। সত্যিকারের মৃত্যু। সম্পূর্ণ রক্ত মাংসের মানুষ। আমাদের মধ্যে একজনই মরে যেতে পারলো। সেই ভাগ্যবান পুরুষটিকে দাহ করতে হবে। শুনুন আপনারা।' কলকাতার নরকঙ্কালরা অবাক হয়ে শুনছিলো একটা রক্তমাংসের মানুষ মরে যেতে পেরেছে। ঘোর কাটতেই সমস্ত কঙ্কাল ছুটে আসছিলো সেই গলিতে। ঈর্ষান্বিত, বিহ্বল সেই নরকঙ্কালের মিছিলের দিকে তাকিয়ে উন্মাদ অবনীদা তখনও চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, 'রক্ত মাংসের পুরুষ। মরে গেছে, একদম মরে গেছে। সেই ভাগ্যবানের নাম স্বপ্নেন্দু।'

সমাপ্ত